অবিস্মরণীয় বাল্যকাল

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

এম. ই. পাবলিশার্স
২/১ বি, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-১৯

উৎসর্গ

আমার নাতনী
অঙ্গনাকে

●

দাদু

॥ তোমাদের জন্যে ॥

কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী মনীষীদের বাল্যকাল এর পূর্বে অনেকেই রচনা করেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থে এমন কয়েকজন মনীষী-ব্যক্তিত্বকে বেছে নিয়েছি যা প্রচলিত-ধারাবহির্ভূত। এ-কালের কিশোর-কিশোরীরা উপকৃত হবে এই সব মনীষীর বাল্যকালের পরিচয় পেয়ে। এঁদের পরবর্তীকালে মনীষী-হয়ে-ওঠার ভিত্তি যে সেকালে কীভাবে গঠিত হয়েছে, তার সামাজিক-পরিচয়, শিক্ষাপ্রণালী, বিশেষ করে এঁদের জীবনে পিতা-মাতার প্রভাব,—একালের বালক বালিকাই শুধু নয়, তাদের পিতা-মাতাও উৎসাহিত হবেন এ-গ্রন্থ পাঠে। ছোটরা যাতে তাদের ভবিষ্যৎ-জীবন-গঠনে উৎসাহিত হয় অজ্ঞাত তথ্য জেনে নিয়ে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এ-গ্রন্থের প্রতিটি বাল্যকাল রচিত হয়েছে।

এ-গ্রন্থের পরিকল্পনা ও প্রকাশের ব্যাপারে এন. ই. পাবলিশার্সের অন্যতম কর্ণধার অনুজপ্রতিম শ্রীস্বপন ঘোষের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ মনে রাখার মতো। যাদের জন্য এ-গ্রন্থ রচিত হলো, তারা উপকৃত হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

করিম বক্স রো গভঃ হাউসিং এস্টেট
ব্লক : এম-১/ ফ্ল্যাট : ৮
কলিকাতা-৭০০০০২

॥ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

ঐতিহাসিক বিতর্ক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

সেকালে বড়লোকদের খেয়াল-খুশি (২য় সং)

প্রেতাত্মার কবলে মনীষীরা

মহাভারতের গল্প (২য় সং)

বিরুদ্ধ সমালোচনায় বঙ্কিম-সাহিত্য

কুলি-কাহিনী (৪র্থ সং) [সম্পাদিত]

। এ-গ্রন্থে আছে ।

রামতনু লাহিড়ী

জন্ম : ১৮১৩ ।। মৃত্যু : ১৮৯৮

তখন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কলকাতার একজন স্বনামধন্য পণ্ডিত। প্রথমে জয়গোপাল ছিলেন উইলিয়ম কেরির বাংলার শিক্ষক, তারপর ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে এই কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে বহাল হলেন। এঁর কাছে পড়েছেন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি সেকালের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ। জয়গোপালের ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারও ছিলেন সেকালের স্বনামধন্য পণ্ডিত। তিনি তখন হেয়ার সাহেবের এক স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং হেয়ারের সঙ্গে সখ্যতাও তাঁর কম নয়। এই গৌরমোহনকে ধ'রে দাদা কেশবচন্দ্র লাহিড়ী ছোট ভাই রামতনুকে হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করে দিতে চাইলেন। কিন্তু চাইলেই তো হয় না! গৌরমোহন রাজি হয়ে একদিন বালক রামতনুকে নিয়ে গেলেন ডেভিড হেয়ারের বাড়িতে। হেয়ার সাহেব বললেন, সিট খালি নেই, এখন কোনো নতুন ছেলেকে নেওয়া যাবে না।

সেযুগে বালকদের ইংরেজি শেখাবার জন্যে সব অভিভাবক উমেদারি করতে যেতেন হেয়ার সাহেবের বাড়িতে। এমন কি হেয়ার সাহেব যখন পাল্‌কি করে বাড়ির বাইরে যেতেন তখনও অভিভাবক ও তাঁদের ছেলেরা পালকির দুধার দিয়ে পাল্‌কি ধ'রে ছুটতে ছুটতে যেত, আর মুখে ছিল সেই অনুরোধ—

আমি খুব গরিব, সাহেব,—আমাকে দয়া কর—তোমার স্কুলে ভর্তি করে নাও।

রামতনুকে নিয়ে যখন গৌরমোহন হতাশ হয়ে ফিরে এলেন ডেভিড হেয়ারের বাড়ি থেকে, তখন রামতনুকে তিনি উপদেশ দিলেন—হেয়ার সাহেবের পাল্‌কির সঙ্গে কিছুদিন ধ'রে ছোট্। তারপর দেখা যাক কি হয়!

রামতনু কৃষ্ণনগরের ছেলে। গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে এসে উঠেছেন চেতলায় দাদা কেশবচন্দ্রের বাসায়। সেখান থেকে রোজ-রোজ পায়ে-হেঁটে-এসে তো উত্তর কলকাতায় সাহেবের পাল্‌কির সঙ্গে দৌড়নো সম্ভব নয় একটি বালকের পক্ষে, তাই রামতনুকে গৌরমোহনই রেখে দিলেন তাঁর বাসায়। বললেন, হেয়ার সাহেব বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাল্‌কির সঙ্গে ছুটবি এবং রোজ। একদিনও ফেল্ করিসনে।

হাতিবাগানে গৌরমোহনের বাসা থেকে সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে রামতনু রোজই বেরিয়ে যেতে লাগলেন হেয়ারের পাল্‌কির সঙ্গে ছুটবার জন্য। কোনও কোনও দিন না-খেয়েই বেরিয়ে যেতে হতো। কারণ হেয়ার সাহেব বাড়ি থেকে বেরুবার আগেই পাল্‌কির সামনে হাজির হতে হবে। এইভাবে বেশ কয়েক দিন পাল্‌কির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়লেন রামতনু। হেয়ারের পাল্‌কি বিভিন্ন জায়গায় যেত এবং কোনো কোনো জায়গায় অনেকক্ষণ ধ'রে থামতো। নাছোড়বান্দা রামতনু কখনও নিরুৎসাহ হতেন না।

একদিন বিকেলে হেয়ার সাহেব বাড়ি ফিরে পাল্‌কি থেকে নামতেই বালক রামতনুর পরিশ্রান্ত-শুকনো মুখের দিকে লক্ষ্য পড়লো।—একি! তোমার মুখ এত শুকনো কেন?—জিজ্ঞেস করলেন হেয়ার—আজ কি তোমার খাওয়া হয়নি? খাবে কিছু?

খাবার কথা শুনে রামতনু ভীত হলেন। হেয়ার যে বিধর্মী! খ্রীষ্টান। তাঁর বাড়িতে কিছু খেলে যে তাঁর জাত যাবে! তাই ভয়ে ভয়ে বললেন, না, আমার খিদে পায়নি।

হেয়ার তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে মিথ্যে বলো না, সত্যি বলো। না, আমার বাড়িতে তোমাকে খেতে হবে না। ঐ যে দেখছো মিঠাইওয়ালা, ওর দোকানে গেলেই ওই তোমাকে খেতে দেবে।

রামতনু জানতেন, হেয়ার সাহেবের বাড়িতে কোনো ছোটো ছেলে এলে শুধু-মুখে সে ফিরে যেত না। তাঁর বাড়ির কাছেই মিষ্টির দোকানের সঙ্গে সাহেবের বন্দোবস্ত করা আছে। কারণ হিন্দু-ধর্মের গোঁড়ামির কথা তাঁর অজানা ছিল না। সাহেবের বাড়িতে কিছু খেলেই তাঁর জাত যাবে। তাই এবার সত্যি কথাই বললেন রামতনু—আজ আমার খাওয়া হয়নি। তখন মহামতি ডেভিড হেয়ার মিষ্টির দোকানের মালিককে বলে দিলেন, এই ছেলেটিকে পেট ভ'রে মিষ্টি খাইয়ে দিয়ো।

এভাবে একদিন দু'দিন করে সপ্তাহ কেটে গেল। মাসও পার হলো। হেয়ারের পাল্‌কির সঙ্গে রামতনু'র ছোটায় ক্লান্তি নেই। দুটি মাসও পেরিয়ে গেল। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এত আগ্রহ! —বিস্মিত হলেন হেয়ার। তারপর একদিন তিনি রামতনুকে তাঁর স্কুলে ফ্রি-ছাত্র হিসেবে ভর্তি করে নিলেন।

কেবলমাত্র বাল্যকালেই নয়, সারাটি জীবন কাটিয়েছেন রামতনু, বিদ্যানুরাগী হয়ে।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে নদিয়ার বারুইহুদা গ্রামে মামার বাড়িতে রামতনু লাহিড়ীর জন্ম হয়। পিতা রামকৃষ্ণ ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজ-বাড়ির দেওয়ান। মায়ের নাম জগদ্ধাত্রীদেবী। সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বিভিন্ন গুণ ছিল রামতনুর চরিত্রে। যেমন তাঁর পিতৃবংশ, তেমনি মাতুলবংশ। তাঁর মাতুলালয় নদিয়ার রায়বংশ দেওয়ান চক্রবর্তী-বংশ রূপে খ্যাত। ব্রাহ্মণ-দরিদ্রদের দান, দেবালয় নির্মাণ, জলের জন্য পুকুর খনন প্রভৃতি বহু পুণ্যকর্মের জন্যে এই রায়বংশ বিখ্যাত।

পাঁচ বছর বয়স পার হতেই রামতনুর হাতে খড়ি দেওয়া হয়।

গ্রামের পাঠশালায়, তখনকার দিনে, অমনোযোগী পড়ুয়াদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। ফলে শাস্তির ভয়ে কোনও কোনও দিন রামতনু পাঠশালা থেকে পালাতেন। পুত্রের বালকসুলভ চপলতা, কুসঙ্গ-দোষে দুষ্টতা, মিথ্যাকথা বলার প্রবণতা দেখে রামতনুর পিতা দুঃখ পেতেন। তাই তিনি পুত্রকে কুসঙ্গ থেকে দূরে রাখতে সব সময়ে চেষ্টা করতেন।

বালক রামতনুর ঘোড়ায় চড়বার বাতিক ছিল অত্যন্ত প্রবল। ঘোড়া পেলেই হলো। বন্ধুর সঙ্গে মিলে ঘোড়া ধ'রে তার পিঠে চড়ে যতক্ষণ-না তিনি তাকে ছোটাতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁর শান্তি হতো না। তখনকার দিনে কৃষ্ণনগরে মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে অনেকে ঘোড়ায় চড়ে কৃষ্ণনগরে আসতেন। তাছাড়া, ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িরও প্রচলন ছিল। এইসব ঘোড়ার মালিকরা কৃষ্ণনগরে এসে ঘোড়াগুলোকে চরাতে ছেড়ে দিতেন মাঠে বা রাস্তার পাশে। তাকে-তাকে থাকতেন সঙ্গীদলসহ রামতনু। সে-সব ঘোড়ায় উঠে দে ছুট্। মালিকরা দেখতে পেলে কখনও কখনও ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে—হাওয়া। ঘোড়া-চড়ার সখ এই বালকদের এমন পেয়ে বসেছিল যে, রামতনুর পরামর্শে তাঁরই এক বন্ধু একজনের বাড়ি থেকে অনেক টাকা চুরি করেছিল ঘোড়া কেনার জন্যে।

পুত্রের মতিগতি দেখে পিতা রামকৃষ্ণ পুত্রকে আর কৃষ্ণনগরে রাখতে চাইলেন না। ভীত ও উৎকণ্ঠিত পিতা রামতনুকে কলকাতায় চেতলায় তাঁর বড়ছেলে কেশবচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেটা ১৮২৬-এর ঘটনা। চেতলার কাছাকাছি তখনও কোনও ইংরেজি স্কুল ছিল না। তিনি তাঁর ভাইকে বাড়িতে রেখে ইংরেজি পড়াতে লাগলেন। সকাল-সন্ধ্যায় ভাইয়ের শিক্ষকতা করতে লাগলেন। তিনি নিজে পারসি ও আরবিতেও পারদর্শী ছিলেন। খাতা বেঁধে দিয়ে তাতে ইংরেজি হাতের লেখাও শেখাতে লাগলেন। ফলে রামতনুর

হাতের লেখা শীঘ্রই খুব সুন্দর হলো। পরবর্তী কালে রামতনুর সুন্দর হাতের লেখার কেউ সুখ্যাতি করলে বলতেন, দাদাই এই লেখার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন।

তারপরই শুরু হলো হেয়ার সাহেবের পাল্‌কির সঙ্গে ছ'মাস ধ'রে দৌড়নো। আগেই সেকথা বলেছি। সেকালে হেয়ার সাহেব ঠনঠনিয়া, কালীতলা, আড়পুলি, কলুটোলা প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন 'স্কুল সোসাইটি'র উদ্যোগে। ডেভিড হেয়ার কে ছিলেন জানো? ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি ঘড়িওয়ালার কাজ নিয়ে এ-দেশে আসেন। তিনি যে খুব শিক্ষিত ছিলেন তা নয়, তবে কর্মসূত্রে এদেশের অনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। তিনি অনুভব করতেন, এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন না হলে দেশের লোকের অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না। রামমোহন রায় তখনও 'রাজা' হননি, সেই ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় কলকাতায় আসার অল্প কিছুকাল পরেই ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো রামমোহনের। ১৮১৮-তে (১লা সেপ্টেম্বর) হেয়ারের উদ্যোগে কলকাতায় 'স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হলো। সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব এবং ডেভিড হেয়ার। বহু পরিশ্রমে, বহু যত্নে অনেকগুলো ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন হেয়ার। হেয়ার সাহেব ছিলেন বালকদের বন্ধু ও অভিভাবক।

কলুটোলার এই হেয়ারের ফ্রি স্কুলেই (বর্তমান হেয়ার স্কুল) রামতনু ভর্তি হলেন। তখন তাঁর বয়স তেরো। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের হাতিবাগানের বাড়িতে থেকেই হেয়ার স্কুলে যাতায়াত করতে লাগলেন রামতনু। কিন্তু মুশকিল হলো, কলকাতার বাসায় তখন বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাস করছেন গৌরমোহন। বাড়িতে কোনো সমবয়স্ক বালক বা কোনো স্ত্রীলোক নেই। একা-একা কি করে থাকবেন রামতনু এখানে? দাদা কেবশচন্দ্র ভাইকে হাতিবাগান

থেকে নিয়ে গেলেন শ্যামপুকুরে, তাঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রামতনু হেয়ার স্কুল থেকে পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে চলে আসেন হিন্দু কলেজে। হিন্দু কলেজে এসে তিনি শিক্ষক ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসেন। এখানে এসে পেলেন কয়েকজন বিশেষ ছাত্রবন্ধুকে। রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ছাত্র পরবর্তীকালে এক-একজন নামকরা লোক হয়েছিলেন। এঁরা সবাই ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য। এঁদের সবাইকে বলা হতো 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর দল।

প্রথম শ্রেণীতে এক বছর পড়ে রামতনু ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিলেন। তখনকার দিনে কৃতি ছাত্রকে বিশেষ পরীক্ষা করে বৃত্তি দেওয়া হতো। রামতনুকে পরীক্ষা করলেন উইলসন প্রিন্সেপ নামে এক সাহেব। তিনি পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে রামতনুকে ষোলো টাকা মাসিক বৃত্তির জন্য মনোনীত করলেন।

ষোলো টাকা বৃত্তি পেয়ে রামতনু তাঁর ছোট দুই ভাই রাধাবিলাস ও কালীচরণকে কলকাতায় নিয়ে এলেন লেখাপড়া শেখাবার জন্যে। নতুন পৃথক্ বাসাও ভাড়া করলেন তাঁর কলেজের কাছে। সেকালে জিনিসপত্র সস্তা হলেও ষোলো টাকায় বাড়ি ভাড়া দিয়ে তিনজনের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আসাক, স্কুলের বেতন ইত্যাদি চালানো খুবই কঠিন ছিল। বাসায় পাচক বা ভৃত্য ছিল না। এঁরা তিন ভাই-ই সংসারের সব কাজ করতেন। ঘর ঝাড়ু দেওয়া, বাসনমাজা, বাজার করা, কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, রান্না করা—সবই নিজেদেরই করতে হতো। দুপুর এবং রাত্রি—দু'বেলা আহার ভিন্ন জলখাবারের পয়সাও থাকতো না। তিন ভাইয়ের কোনো জুতো ছিল না, খালি পায়ে তাঁরা স্কুলে যেতেন। অর্থের টানাটানি সে-সময়ে এমন পর্যায়ে চলে যেত যে, বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে, এমন কি ছাত্রদরদী শিক্ষক হেয়ার সাহেবের কাছ থেকেও তাঁকে টাকা কর্জ নিতে হতো।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামতনু হিন্দু কলেজ থেকে পাশ করে ঐ কলেজেই এক নিম্নতম শিক্ষকের চাক্‌রি পেলেন। বেতন তিরিশ টাকা। রামতনু তখন কুড়ি বছরের যুবক। পরবর্তীকালে, ব্রাহ্মণ-সন্তান রামতনু পৈতে ফেলে দিয়ে হিন্দুসমাজকে আলোড়িত করে-ছিলেন। ফলে গোঁড়া হিন্দুসমাজের কর্তাব্যক্তিরা রামতনুকে নানা-ভাবে নির্যাতন করতে লাগলেন। রামতনুর ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়ে গেল। এসময়ে বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সেই যে ১৮৫১-র এপ্রিল মাসে বর্ধমানে মাষ্টা'রী নিয়ে চলে গেলেন। পৈতে ত্যাগ করার জন্য এখানেও হিন্দুসমাজ তাঁকে নিয়ে গোলমাল বাধালো। ধোপা-নাপিত বন্ধ হবার জন্যে তাঁকে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করে সংসারের অনেক কাজ নিজের হাতে করতে হতো। বাড়িতে যারা কাজের লোক ছিল, সেই ঝি-চাকররাও কাজ ছেড়ে চলে গেল। জল আনা, রান্নার জন্যে কাঠ কাটা, বাজার করা—সবই তাঁকে নিজেকেই করতে হতো।

বর্ধমান থেকে বালি-উত্তরপাড়ায় ইংরেজি স্কুলে হেডমাষ্টার হয়ে এলেন ১৮৫২-তে। এখানে তাঁর প্রতি সামাজিক নির্যাতন কিছুটা কমলেও একেবারে শেষ হলো না। রান্নার বামুনঠাকুর দু'দিন কাজ করে আর কাজে আসে না, চাকর-বাকর দু'তিন দিন কাজ করে পালিয়ে যায়। মহা মুশকিলে পড়েন রামতনু প্রতি মুহূর্তে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই অনুরোধ করেন, আবার পৈতে নিতে। ব্যতিক্রম শুধু বিদ্যাসাগর। তিনি কলকাতা থেকে চাকর ঠিক করে পাঠান, রান্নার জন্যে নতুন পাচকের ব্যবস্থা করে দেন। এমন কি, সংসারের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কলকাতা থেকে কিনে বালিতে পাঠিয়ে দেন নৌকো করে।

সুহৃদ্ রামতনুর মতের ওপর যে বিদ্যাসাগরের অগাধ বিশ্বাস! তিনি জানতেন, ধর্মের ব্যাপারে রামতনুর মতামত ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। ধর্মের কুসংস্কার ও গোঁড়ামিকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি। যদিও

তাঁর প্রতি ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব ছিল, কিন্তু সে-ধর্মের গোঁড়ামি তিনি পরিহার করে চলতেন। তিনি মনে করতেন, ধর্মের প্রতি মানুষের যে-বিশ্বাস তার ভিত্তিই তো আত্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি উত্তরপাড়া, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা করেছেন। ছাত্রেরা ছিল তাঁর প্রাণ।

আগেই বলেছি, রামতনু বাল্যকালে মারের ভয়ে মাঝে-মাঝে পাঠশালা কামাই করতেন। তখনকার দিনে পাঠশালার গুরুমশাইয়ের শাস্তি দেবার পদ্ধতি কত রকম এবং কীরূপ বীভৎস ছিল তার বিবরণ দিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী: 'গুরু মহাশয়গণ বর্তমান স্কুলসমূহের শিক্ষকগণের ন্যায় কোনও কমিটি বা কোনও ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট বেতন পাইতেন না। প্রত্যেক গৃহস্থ আপন আপন বালককে বা বালকদিগকে পাঠশালে দিবার সময় গুরুমহাশয়ের সহিত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপে মাসে সামান্য ১০/১২ টাকা আয় হইত। তৎপরে যাত্রা, মহোৎসব, পার্বণ বা পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে উপরি কিছু কিছু জুটিত। তাহাতেই গুরুমহাশয়দিগের সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত। শুনিতে পাওয়া যায়, যে ছেলে লুকাইয়া গুরুমহাশয়কে যত দিতে পারিত, সে তত তাঁহার প্রিয় হইত। সে অনুপস্থিত থাকিলে বা পাঠে অমনোযোগী হইলেও সমুচিত সাজা পাইত না। যেসকল বালক কিছু দিতে পারিত না, তাহাদিগকে সর্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। উঠিতে-বসিতে, নড়িতে-চড়িতে গুরুমহাশয়ের বেত্র তাহাদের পৃষ্ঠে পড়িত। হাতছড়ি, নাড়ুগোপাল, ত্রিভঙ্গ প্রভৃতি সাজার বিবিধ প্রকার ও প্রণালী ছিল। পাঠশালে আসিতে বিলম্ব হইলে হাতছড়ি খাইতে হইত; অর্থাৎ আসনে বসিবার পূর্বে গুরু-মহাশয়ের সমক্ষে দক্ষিণ হস্তের পাতা পাতিয়া দাঁড়াইতে হইত, অমনি সপাসপ্, পাঁচ বা দশ ঘা বেত তদুপরি পড়িত। এই গেল হাতছড়ি।

নাড়ুগোপাল আর এক প্রকার। অপরাধী বালককে গোপালের ন্যায়, অর্থাৎ চতুষ্পদশালী শিশুর ন্যায় দুই পদ ও এক হস্তের উপর রাখিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তে একখানি এগার ইঞ্চ ইট বা অপর কোনো

ভারি দ্রব্য চাপাইয়া দেওয়া হইত ; হাত ভারিয়া গেলে, বা কোনও প্রকারে ভারি দ্রব্যটি স্বস্থানভ্রষ্ট হইলে তাহার পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র উত্তোলনপূর্বক গুরুতর বেত্রপ্রহার করা হইত।

ত্রিভঙ্গ আর এক প্রকার। শ্যামের বঙ্কিম মূর্তির ন্যায় বালককে একপায়ে দণ্ডায়মান করিয়া হস্তে একটি গুরুদ্রব্য দেওয়া হইত। একটু হেলিলে বা বারেকমাত্র পা-খানি মাটিতে ফেলিলে অমনি পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র তুলিয়া কঠিন বেত্রাঘাত করা হইত। কোনও কোনও গুরু ইহার অপেক্ষাও গুরুতর শাস্তি দিতেন ; তাহাকে চ্যাংদোলা বলিত। কোনও বালক প্রহারের ভয়ে পাঠশাল হইতে পালাইলে বা পাঠশালে না আসিলে এই চ্যাংদোলা সাজা পাইত। তাহা এই, তাহাকে বন্দী করিবার জন্য চারি-পাঁচ জন অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক ও বলবান ছাত্র প্রেরিত হইত। তাহারা তাহাকে ঘরে, বাহিরে, পথে-ঘাটে বা বৃক্ষশাখায় যেখানে পাইত, সেখান হইতে বন্দী করিয়া আনিত। আনিবার সময় তাহাকে হাঁটিয়া আসিতে দিত না, হাতে পায়ে ধরিয়া ঝুলাইয়া আনিত। তাহার নাম চ্যাংদোলা। এই চ্যাংদোলা অবস্থাতে বালক পাঠশালে উপস্থিত হইবামাত্র গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে সেই অসহায় বালককে আক্রমণ করিতেন। এই প্রহার এক এক সময়ে এত গুরুতর হইত যে, হতভাগ্য বালক ভয়ে বা প্রহারের যাতনায় মলমূত্রে ক্লিন্ন হইয়া যাইত।' এছাড়াও শাস্তি ছিল। মাটিতে বসে বালক তার একখানা পা নিজের কাঁধের উপর তুলে দেবে, বা বালকটি নিজের উরুর তলা দিয়ে দুটি হাত চালিয়ে নিজের কান ধরে থাকবে। আর একটি হলো, ছাত্রের হাত-পা বেঁধে পশ্চাদ্দেশের কাপড় তুলে জলবিছুটি দেওয়া হবে, সে চুলকোতে পারবে না। বা, একটা থলের মধ্যে একটা বিড়ালের সঙ্গে ছাত্রটিকে পুরে মাটিতে গড়ানো হবে এবং ছাত্রটি বিড়ালের নখ ও দাঁতের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হবে।

সেদিনের ছাত্রদের এরকম বীভৎস শাস্তির কথা শুনলেও ভয়ে আজ গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। অবশ্য, এসব শাস্তি শহরের থেকে

গ্রামের পাঠশালাতেই বেশি হতো। রামতনুও এমন সব শাস্তির ভয়ে পাঠশালা পালাতেন।

শত দারিদ্র্য, শত নির্যাতন যে ব্যক্তিকে ধর্ম, সারল্য, পরহিতব্রত ও সত্যের পথ থেকে টলাতে পারে না—তাঁরই নাম বোধকরি রামতনু লাহিড়ী।

দীনবন্ধু মিত্র তাই তো তাঁর 'সুরধুনী কাব্য'-এ রামতনুকে নিয়ে লিখেছেন :

'পরম ধার্মিকবর এক মহাশয়,
সত্য-বিমণ্ডিত তাঁর কোমলহৃদয়।
সারল্যের পুত্তলিকা পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ সমজ্ঞান ঋষিদের মত।
জিতেন্দ্রিয়, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিরাজিত ধর্ম উপদেশ।
একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশ দিন থাকে ভাল দুর্বিনীত মন।
বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত,
তাঁর নাম রামতনু সকলে বিদিত।'

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ আগস্ট রামতনু ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি বেঁচে থাকতেই বিদ্যাসাগরের সহায়তায় তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমার লাহিড়ী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'এস. কে. লাহিড়ী' নাম দিয়ে কলেজ স্ট্রীটে বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন।

———

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম ঃ ১৮২০ ॥ মৃত্যু ঃ ১৮৯১

ছোটবেলা থেকেই একগুঁয়ে বিদ্যাসাগর। জেদি বিদ্যাসাগর নিজে যা ভালো মনে করতেন তাই-ই করতেন। সেখানে না-বাবা, না-ভাই, না-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, কেউ নয়।

এ জন্যে ছোটবেলায় বিস্তর মার খেয়েছেন বাবা ঠাকুরদাসের কাছে। তবুও নিজের গোঁ ছাড়েননি। নিজের জিদ্ বজায় রাখার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিদ্যাসাগর ছোটবেলা থেকেই। ঘাড় বাঁকা করলে আর কারুর সাধ্য ছিল না তাঁর ঘাড় সোজা করার।

বাবা দুঃখ করে বলতেন, তোর ঠাকুরদা যে তোকে ছোটবেলায় ঘাড়-বাঁকা এঁড়ে-বাছুরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, এটা সত্যি। আমি বলি, তুই শুধু এঁড়ে-বাছুর ন'স, তুই ঘাড-কেঁদো।

বাবা যদি বলেন, আজ ফর্সা কাপড় পরে তুই স্কুলে যাবি, ঈশ্বর বলতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরে যাবো। বাবা যদি বলেন, আজ গঙ্গার ঘাটে তোকে স্নান করাতে নিয়ে যাবো, অমনি বালক ঈশ্বরের উত্তর, আজ বাড়িতেই স্নান করবো।

বড়বাজারের টাঁকশালের গঙ্গার ঘাটে জোর করে নামিয়ে দিয়েছেন বাবা তাঁর শিশুপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে। স্নান করতেই হবে। ঈশ্বর কয়েক পা গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। না, গঙ্গায় স্নান করবো না। বাবা কিল-চড় মেরেও স্নান করাতে পারেননি ঈশ্বরকে। একবার যদি 'না' বলেছেন, কেউ তাঁকে 'হাঁ' করাতে পারেননি। ফলে তিনি

নতুন কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন অনেক সময়। বলতেন, ঈশ্বর তুমি আজ ময়লা কাপড় পরে স্কুলে যেও। ফল হতো উল্টো। বাবা বলতেন, আজ বাড়িতেই স্নান কর। ঈশ্বরের গোঁ—গঙ্গায় যাবো। অর্থাৎ ঈশ্বরকে দিয়ে যে-টি করাতে হবে, বলতে হবে তার উল্টোটা। তাহলেই ঠিক মতো কাজ হয়ে যাবে।

এই জিদ, কিন্তু অনেক ভালো কাজ করিয়ে নিয়েছে ঈশ্বরচন্দ্রকে দিয়ে। 'আমার চেয়ে ক্লাশে পড়াশোনায় ভালো আর কেউ হবে না'—এই জিদ্ ঈশ্বরচন্দ্রকে পড়াশোনা করতে সারা জীবন উৎসাহ জুগিয়েছে। শৈশবে প্রায় প্রতিদিন সমস্ত রাত পড়াশোনায় কাটিয়েছেন! বাবাকে বলতেন, রাত দশটায় আমি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বো, আপনি রাত বারোটায় আমাকে জাগিয়ে দেবেন।

তারপর সমস্ত রাত পাঠাভ্যাস।

বাবা পড়তেন মুশকিলে। রাত দশটায় খাওয়া-দাওয়া সেরে দু' ঘণ্টা ঠায় বসে থাকতেন ছেলেকে বারোটায় জাগিয়ে দেবার জন্যে। আরমানি গীর্জার ঘড়িতে ঢং-ঢং করে বাজতো বারোটা। অমনি বাবা জাগিয়ে দিতেন বালক ঈশ্বরকে। তখন ঈশ্বরচন্দ্র পড়েন ব্যাকরণ-শ্রেণীতে। তিন বছর ছয় মাস ছিলেন তিনি এই শ্রেণীতে। ভট্টিকাব্যের পাঁচ শো শ্লোক কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন তিনি এ-সময়ে। কী অসামান্য জিদ্। অত্যধিক পরিশ্রমে মাঝে-মধ্যে অসুস্থও হয়ে পড়তেন তিনি। তবুও ক্ষান্ত হতেন না।

এই একরোখা আপোষহীন জেদি ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। অত্যন্ত দরিদ্র-পরিবার। দরিদ্র হলে কি হয়, তাঁর পরিবারে ছিল সৎ-আচরণ, সৎ-অনুষ্ঠান এবং শিশুদের শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন পিতার প্রথম সন্তান। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র যেন বড় হয়ে গ্রামের টোলের পণ্ডিতী করেন। কারণ টুলো পণ্ডিতী-ই এই পরিবারের একমাত্র আয়ের পথ। এ-বংশের সকলেই সংস্কৃত-শিক্ষালাভ করে

অধ্যাপকরূপে পরিচিত। ঠাকুরদাস নিজে বেশি দূর লেখাপড়া শিখতে পারেননি, কারণ সংসারের দারিদ্র্য। তাই তিনি মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত শিখে নিজের বাড়িতে চতুষ্পাঠী তৈরি করে গ্রামের ও নানা স্থানের বালকদের সংস্কৃত শিক্ষা দান করবেন। দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ঠাকুরদাস দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন চাকরির আশায়। তখন কতই তাঁর বয়স! মাত্র পনেরো বছর। মাত্র দু' টাকা মাসিক বেতনে ঠাকুরদাস এক আফিসে চাকরি পেলেন। বীরসিংহের বাড়িতে এ-খবর পৌঁছুতেই বাড়িতে এক উৎসব শুরু হয়ে গেল। দু' টাকা বেতনের চাকরি হয়েছে ঠাকুরদাসের—সবাই আনন্দে আত্মহারা।

আনন্দ হবেই না-বা কেন? সেকালের দু' টাকা! তখনকার দিনে চালের মণ ছিল যে আট আনা, এক টাকায় এক মণ দুধ। শাক-সব্‌জি তরি-তরকারি তো কিনতেই হতো না।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন ভূমিষ্ঠ হন, পিতা ঠাকুরদাস তখন বাড়িতে ছিলেন না। গিয়েছিলেন গ্রামের কাছেই কোমরগঞ্জের হাটে। ঠাকুরদা রামজয় তর্কভূষণ যাচ্ছিলেন পুত্র ঠাকুরদাসকে কোমরগঞ্জের হাটে খবর দিতে। রাস্তায় দেখা পুত্রের সঙ্গে। ঠাকুরদাস হাট করে ফিরছিলেন বাড়িতে। দেখা হতেই আনন্দসহকারে বললেন, একটা এঁড়ে-বাছুর হয়েছে। সে-সময় তাঁদের বাড়িতে আসন্ন-প্রসবা একটি গাই-গোরু ছিল। ঠাকুরদাস খবরটা শুনেই হন-হন করে পা চালিয়ে বাড়িতেই এসেই গোয়ালের দিকে পা বাড়ালেন। বাবা রামজয় হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—না না, ওদিকে নয়, এদিকে এসো। এঁড়ে-বাছুরকে দেখিয়ে দিচ্ছি।—এই বলে সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করলেন। নবজাত শিশুকে দেখিয়ে দিলেন তিনি।

ক্ষণজন্মা বালক, এঁড়ে-বাছুরের মতো একগুঁয়ে স্বভাবের হবে—এ ভবিষ্যদ্বাণী তো ঠাকুরদা রামজয়ই করে দিয়েছিলেন জন্মের দিনেই। তিনি আরো বলেছিলেন—এ শিশু ভবিষ্যতে হবে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, পরম দয়ালু, এর যশের সৌরভে চারিদিক হবে পূর্ণ। তাই এর নাম

রাখলাম ঈশ্বরচন্দ্র। সূতিকাগৃহেই দেওয়া ঠাকুরদার এই নাম চিরস্থায়ী হয়েছে। স্বার্থক হয়েছে। অন্য কোনো নামকরণ করা হয়নি ঈশ্বরচন্দ্রের।

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পর থেকেই ঠাকুরদাসের সংসারে শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো। ফলে ঈশ্বরচন্দ্রকে সবাই অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে দুরন্তপনাও বেড়ে গেল ঈশ্বরচন্দ্রের। সবাই বললেন, এবার ঈশ্বরকে পাঠশালায় ভর্তি করে দাও। সে সময়ে বীরসিংহ গ্রামে পাঠশালা খুলেছিলেন কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। সেখানেই ভর্তি করে দেওয়া হলো ঈশ্বরচন্দ্রকে। বয়স তখন তাঁর পাঁচ বছর। হাজার দুষ্টুমি সত্ত্বেও লেখা-পড়ায় কিন্তু বালক ঈশ্বরের অত্যন্ত মনোযোগ। যেমন তাঁর স্মরণশক্তি, তেমনি তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। গুরুমশাইয়ের কাছ থেকে যে-পাঠই শিক্ষা করেন, কখনই তা ভুলে যান না। ফলে গুরু কালীকান্ত খুবই স্নেহ করেন ঈশ্বরকে, পুত্রের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন তাঁর এই মেধাবী ছাত্রকে। অনেক সময়ে এমনও হতো যে, অন্যান্য ছাত্রদের ছুটি দিয়ে গুরুমশাই ঈশ্বরকে নিয়ে পড়াতে বসতেন। বিকেল হতো, বিকেল গড়িয়ে আসতো রাতে। ঈশ্বরচন্দ্রকে কোলে করে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিতেন গুরু কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

একদিন কালীকান্ত বললেন ঠাকুরদাসকে, এবার ঈশ্বরকে নিয়ে কলকাতায় যাওয়া ভালো। ওকে ইংরেজি শিক্ষা দিতে হবে। আমার পাঠশালায় যা শিখবার, সব শিখে ফেলেছে ঈশ্বর। ঈশ্বরের হাতের লেখাও খুব সুন্দর। ওকে কলকাতার কোনো ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দাও। ও যেমন মেধাবী, স্মৃতিশক্তিও তেমনি প্রবল। তোমরা দেখো, এ বালক যা শিখবে তাতেই ভালো ফল করবে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। পিতা ঠাকুরদাস কলকাতায় ফেরার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে এলেন। আসার সময়ে সঙ্গে এলেন গুরুমশাই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। বীরসিংহ থেকে কলকাতায় আসতে হলে তখন পায়ে হেঁটেই আসতে হতো। তিনজনই

হাঁটতে হাঁটতে আসছেন, কখনও বালক ঈশ্বরচন্দ্র পথশ্রান্ত হয়ে উঠছেন পিতার কোলে, কখনও গুরুমশাইয়ের কাঁধে। সিয়াখালার কাছে শালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠে বালক ঈশ্বরচন্দ্র দেখলেন রাস্তার ধারে বাটনা-বাটা শিলের মতো কি-যেন একটা পোঁতা আছে। আবার কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ঠিক অমনি আর একখানি শিল দেখতে পেলেন। কৌতুহল হলো বালকের। জিজ্ঞেস করলেন পিতাকে, রাস্তার ধারে শিল পোঁতা কেন বাবা? পুত্রের কথায় ঠাকুরদাস হেসে বললেন, ওগুলো শিল নয়, মাইল-স্টোন।

—মাইল-স্টোন কাকে বলে?

—ওটা ইংরেজি কথা। এক মাইল হলো আমাদের হিসেবে আধক্রোশ, আর স্টোন-এর অর্থ হলো পাথর। প্রত্যেক আধক্রোশ অন্তর ঐরকম পাথর পোঁতা আছে। কলকাতার একমাইল অন্তরে যে পাথর আছে তাতে 'এক' সংখ্যা খোদাই করা আছে। আর এই যে পাথরখানি তুমি দেখছো, ওতে আছে উনিশ লেখা। অর্থাৎ কলকাতা এখান থেকে উনিশ মাইল বা সাড়ে নয় ক্রোশ।—এই বলে তিনি পুত্রকে পাথরখানি ভালো করে দেখালেন।

ঈশ্বরচন্দ্র মনে মনে নামতায় হিসেব করলেন একের পিঠে নয় উনিশ। তারপর সংখ্যাটির ওপর হাত দিয়ে বললেন, তাহলে এটা এক আর পরেরটা নয়।

পিতা বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

বালক তখন মনে মনে ঠিক করলেন, পথে যেতে-যেতেই ইংরেজি সংখ্যা সব শিখে নেবেন। উনিশ থেকে যখন দশ-এ এলেন ঈশ্বরচন্দ্র তখন বাবাকে বললেন, আমার ইংরেজি অঙ্ক শেখা হয়ে গেছে। আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা শিখে ফেলেছি।

শুধু শিখলেই তো হবে না! পরীক্ষাও দেওয়া চাই। বিশেষ করে গুরুমশাই যখন সঙ্গেই রয়েছেন।

পিতা পরীক্ষার জন্যে ক্রমে ক্রমে নয়, আট, সাত জিজ্ঞেস করায় ঈশ্বরচন্দ্র সব ঠিক ঠিক উত্তর দিলেন। ঠাকুরদাসের কেমন যেন

সন্দেহ হলো। বললেন, চলো। তারপর তিনি ছয় সংখ্যাটিকে না দেখিয়ে একেবারে পাঁচে চলে এলেন। পাঁচের স্টোনটিকে দেখিয়ে বললেন, বল তো, এটি কত সংখ্যা? ঈশ্বরচন্দ্র ভালো করে সংখ্যাটিকে দেখলেন। তারপরে বললেন, বাবা, এটা ছয় হওয়ার কথা। বোধহয় ভুল করে পাঁচ খোদাই করেছে। সন্তুষ্ট হলেন ঠাকুরদাস। বললেন, তুমি ঠিক বলেছ—এটা পাঁচ। তোমাকে ছয়ের অঙ্কটি না দেখিয়ে এটা পরীক্ষা করছিলাম, তুমি ঠিক বলতে পারো কি না! গুরুমশাই খুবই সন্তুষ্ট হয়ে ঠাকুরদাসকে বললেন, বেঁচে থাকলে ঈশ্বর মানুষের মতো মানুষ হবে। বালক ঈশ্বরচন্দ্র এঁদের দু'জনের আনন্দ দেখে নিজেও খুব আনন্দিত হলেন।

বড়বাজারের জগদ্দুর্লভ সিংহের আশ্রয়ে থেকে ঈশ্বরচন্দ্র পাড়ার এক পাঠশালায় ভর্তি হলেন। তখন তাঁর পিতার মাসিক বেতন দশ টাকা। তার কিছুদিন পরে ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হলো। তখন তাঁর বয়স নয় বছর। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে বড়বাজার থেকে সংস্কৃত কলেজ—পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতেন। ব্যাকরণ শ্রেণীর পাঠ শেষ করে সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবেশ করলেন। এই শ্রেণীতে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, রাঘবপাণ্ডবীয় প্রভৃতি গ্রন্থের প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে পুরস্কার পেলেন। দ্বিতীয় বছরে মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তরচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে শেষ পরীক্ষায় সব ছাত্রদের পিছনে রেখে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পরীক্ষার ফল দেখে তাঁর শিক্ষকেরা বিস্মিত হলেন। এই বয়সেই ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় লোকের সঙ্গে অনর্গল কথা বলতে পারতেন। অথচ এই সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবেশ করতে তাঁকে প্রবল বাধার সামনে পড়তে হয়েছিল! মাত্র এগারো বছর বয়সের এই সামান্য বালক আর সংস্কৃত সাহিত্যের কি বুঝবে? শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তো বলেই বসলেন, তোমাকে সাহিত্যশ্রেণীতে নেওয়া যাবে না। তোমার বয়স খুব অল্প।

অভিমানী ঈশ্বরচন্দ্র জয়গোপালের মুখের ওপরই বলে দিলেন,

আমাকে পরীক্ষা করে নিন। যদি পারি তবেই নেবেন, নইলে অন্য স্কুলে চলে যাব।

রাজি হলেন শিক্ষক জয়গোপাল। ঈশ্বরচন্দ্রকে ভট্টির কয়েকটি কঠিন কবিতার অর্থ বুঝিয়ে দিতে বললেন। ছাত্রের প্রতি গুরুর চ্যালেঞ্জ!

ভট্টিকাব্যের সেদিন যে-সুব্যাখ্যা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র, তর্কালঙ্কার মশাই তো শুনে থ'। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি সাহিত্য-শ্রেণীতে ভর্তি করে নিয়েছিলেন সেদিনই। শুধু তাই নয়, চিরদিন নিজের পুত্রের মতো স্নেহ করতেন এবং সযত্নে শিক্ষা দিতেন।

এ-সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে বাসায় প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় রান্না করতে হতো। বাসায় ঝি-চাকর কেউ ছিল না। কুট্‌নো কাটা, থালা-বাসন মাজা—প্রায় সব কাজ করে তারপর পড়াশোনার সময় পেতেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে তিনি। কঠোর পরিশ্রম করেই বালক ঈশ্বরচন্দ্র নিজের বিদ্যাশিক্ষার কাজ চালিয়ে গেছেন। কৃতিত্বের সঙ্গে সাহিত্য-শ্রেণীর পাঠ শেষ করে অলঙ্কার-শ্রেণীতে উঠলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স পনেরো। সেকালের প্রখ্যাত পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মশাই ছিলেন অলঙ্কারের অধ্যাপক। ঈশ্বরচন্দ্রও তিন শ্রেণীতে ভালোভাবে পড়াশোনা করে অচিরেই হয়ে উঠলেন তর্কবাগীশ মশাইয়ের অত্যন্ত প্রিয়। ন্যায়শাস্ত্র, বেদ-বেদান্ত, স্মৃতিশাস্ত্র, মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রমে পড়ে ফেললেন। ল' কমিটির পরীক্ষায় বসলেন। বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে ল'-ও পাশ করলেন। ঠিক সেই সময়ে ত্রিপুরার জজ-পণ্ডিতের পদ খালি হয়। ঈশ্বরচন্দ্র আবেদন করেন ঐ পদের জন্যে। নিয়োগ-পত্রও পেলেন। কিন্তু বাবার অসম্মতি। না, সতেরো বছর বয়সে তোমাকে বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে না। আমার দারিদ্র্যের সংসার জানি, তবুও তোমাকে বিদেশে পাঠিয়ে আমরা কেউ থাকতে পারবো না। ঈশ্বরচন্দ্রের চাকরিতে যাওয়া হলো না। ঈশ্বরের কাছে তাঁর বাবা-মা যে ঈশ্বর অপেক্ষাও বড়। স্বর্গাদপি গরীয়সী। জননী

ভগবতী দেবীর সম্পর্কে তাই তো ঈশ্বরচন্দ্র একবার বলেছিলেন, 'আমি যদি আমার মায়ের গুণরাশির শতাংশের একাংশ মাত্রও পাইতাম, তাহা হইলে কৃতার্থ হইতাম। আমি এমন মায়ের সন্তান, ইহা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি।'

ভগবতী দেবী ছিলেন অত্যন্ত দয়াশীলা। পরের দুঃখ দেখলেই তার প্রতিকার না-করা পর্যন্ত শান্তি পেতেন না। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবাই ছিল তাঁর কাছে আপনজন। যে-কোনও অভাবী মানুষ ভগবতী দেবীর কাছে এলেই হলো। সাহায্য কিছু না নিয়ে সে ফিরবেই না। তাছাড়া পাড়ার লোক তো বটেই, গ্রামের নীচু জাতের লোকদেরও অসুখ-বিসুখে ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা, তাদের বাড়িতে রান্নার লোক না থাকলে নিজের বাড়ি থেকে পথ্য রেঁধে নিয়ে গিয়ে তাদের খাইয়ে আসা—এমনি সব পরসেবাতেই দিনের অধিকাংশ সময় কেটে যেত ভগবতী দেবীর।

কেন, সেই যে বিদ্যাসাগর যেদিন বাড়ির জন্যে শীতকালে কলকাতা থেকে লেপ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেদিনও তো মা ছেলেকে লিখে পাঠালেন—এ কয়েকখানি লেপে আমার কি হবে? আমরা শীতকালে লেপ-গায়ে দিয়ে শোব আর গরিব প্রতিবেশীরা শীতে কষ্ট পাবে? তা হবে না। এ লেপ ক'খানি গরিবদের দান করে দিয়েছি।

চিঠি পেয়েই ছেলের উত্তর: বেশ করেছো। তোমার কতগুলো লেপ হলে দান করেও তোমার নিজের জন্যে অন্তত একখানা রাখতে পারবে? তোমার উত্তর পেলেই ততগুলোই পাঠাবো।

বিচিত্র উপদানে গঠিত ছিল ভগবতী দেবীর মন। কখনও পরিশ্রমে কাতর হতেন না। দুপুরে সবাইকে আহার করিয়ে তবে তিনি আহার করতেন। হয়তো কোনো দিন ভাত নিয়ে খেতে বসেছেন, এলো কোনো উপবাসী ভিক্ষুক। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাতের থালা তার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে নিজে অভুক্ত রইলেন। দুপুরে বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি দেখতেন কোনো অভুক্ত দরিদ্র

ব্যক্তি তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছে কি না। হয় তাকে ভাত, না হয় জল-পান করিয়ে ভগবতী দেবী প্রসন্ন হতেন। এমন মায়ের অমন সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র তো করুণার সাগরই হবেন, এতে আশ্চর্য কি! লোকের দুঃখে তিনি কাঁদতেন, আগু-পিছু না ভেবেই সে দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করতেন।

ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রের শ্রেণীতে তিনি যখন পড়াশোনা করছেন তখন দু'মাসের জন্য সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদটি খালি হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্রের উপযুক্ততা স্মরণ করে তাঁকেই সেই পদটি গ্রহণ করতে বললেন। মাসিক বেতন চল্লিশ টাকা। ব্যাকরণ-শ্রেণীতে পড়াতে রাজি হয়ে গেলেন ঈশ্বরচন্দ্র। দু'মাসের বেতন আশী টাকা পেয়েই পিতার হাতে দিয়ে বললেন, এই টাকায় আপনি তীর্থভ্রমণ করে আসুন। পুত্রের পিতৃভক্তিতে ঠাকুরদাস আনন্দিত হলেন। তারপর গয়ায় তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়লেন।

তীর্থ করে ফিরে এসে পিতা ঠাকুরদাস দেখলেন, তাঁর পুত্র দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান পাওয়ায় এক শ' টাকা, সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করার জন্য এক শ' টাকা, আইন পরীক্ষায় পুরস্কার পঁচিশ টাকা এবং উৎকৃষ্ট হাতের লেখার জন্য আট টাকা, মোট দু'শ তেত্রিশ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র পুরো টাকাটা পিতার হাতে দিয়ে বললেন—বাবা, এটাকা ক'টি দিয়ে আপনি ঋণ শোধ করুন।

আনন্দে উৎফুল্ল পিতা নিশ্চিন্ত হলেন।

এগারো বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের উপনয়ন-সংস্কার হয়। ছাত্রাবস্থায় চৌদ্দ বছর বয়সে ক্ষীরপাই-নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দীনময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ছাত্রজীবন শেষ হতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রথম পণ্ডিতের পদে তাঁর চাকরি হয় (১৮৪১, ২৯ ডিসেম্বর)। বেতন মাসিক পঞ্চাশ টাকা। তার পর সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৫০, ৪ ডিসেম্বর) প্রভৃতি কাজ করেছেন। তাছাড়া সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর দান অতুলনীয়।

বাংলায় শিক্ষাপ্রসারে ছোটদের জন্য তাঁর লেখা 'বোধোদয়' (১৮৫১), 'ঋজুপাঠ' : ১ম-৩য় ভাগ (১৮৫১), 'বর্ণপরিচয়' : ১ম, ২য় ভাগ (১৮৫৫), 'ব্যাকরণ কৌমুদী' : ১ম-৪র্থ ভাগ (১৮৫৩-১৮৬২) প্রভৃতি গ্রন্থ ছাড়াও তিনি লিখেছিলেন, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮), 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), 'সীতার বনবাস' (১৮৬০), 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯), প্রভৃতি গ্রন্থ।

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যেকালে 'বিদ্যাসাগর'-রূপে পরিচিত হয়েছিলেন সেকালে তো আরও অনেকেই 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন। তবুও আজ আমরা 'বিদ্যাসাগর' বলতে একজনকেই বুঝি। তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুলাই (১৩ শ্রাবণ ১২৯৮) রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময়ে সত্তর বছর বয়সে বাংলার এই মনীষীর জীবনদীপ নিবে যায়।

প্যারীচরণ সরকার

জন্ম: ১৮২৩ ॥ মৃত্যু: ১৮৭৫

আগের দিনে ইংরেজিতে হাতে-খড়ি হতো 'ফার্স্ট বুক অব্ রিডিং' পড়ে। বইটির মলাটের ছবিটিও শিশুদের দেখতে হতো। এক ভদ্রলোক বাঁ-হাতে একখানি বই বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। পরণে তাঁর অতিরিক্ত ঝুলওয়ালা পাঞ্জাবি আর পাজামা। গায়ে একখানি চাদর—গলা এবং হাতের ওপর দিয়ে জড়ানো। মাথায় বেশ খানিকটা টাক। ইনিই বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী মনীষী প্যারীচরণ সরকার। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেদিন প্যারীচরণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'আমি জীবনে চার জন মানুষ দেখেছি তার মধ্যে একজন ছিলেন, প্যারীচরণ বাবু।' কি শিক্ষকতায়, কি সামাজিক সৎ-অনুষ্ঠানে, কি দানশীলতায় প্যারীচরণ ছিলেন সেযুগের আদর্শ মানুষ। সরকারী পত্রিকা 'এডুকেশন গেটেজ'ও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন। কলকাতায় শিক্ষাবিস্তারে তিনি যেমন অক্লান্তকর্মী, বারাসতের বিভিন্ন সদনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন বিশেষ অগ্রণী।

প্যারীচরণের জন্ম হয়েছিল কলকাতায় চোরবাগানে মামার বাড়িতে। ইংরেজি ১৮২৩ সালের ২৩ জানুআরি (বাংলা ১২৩০ সালের ২৮ মাঘ) প্যারীচরণের জন্মদিন। এ-বাড়িটি পরে প্যারীচরণ সরকারের বাড়ি বলে সবাই চিনতো। এটি পরবর্তীকালে ভুবন সরকারের বাড়ি নামে বিখ্যাত। পিতা ভৈরবচন্দ্র এবং মাতা চোরবাগানের সুপ্রসিদ্ধ গোকুলচন্দ্র বসুর তৃতীয় পুত্র

ভৈরবচরণ বসুর একমাত্র কন্যা দ্রবময়ী। প্যারীচরণের মামার বাড়িও তাঁদের নিজেদের বাড়ির কাছেই।

বাল্যকালে প্যারীচরণ নিজের বাড়িতে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর বড়দা পার্বতীচরণ ছিলেন প্যারীচরণের প্রাথমিক শিক্ষাগুরু। কেবল দাদাই নয়, আর একজনের কাছেও তাঁকে শিক্ষা নিতে হয়েছিল—তিনি তাঁর মা দ্রবময়ীদেবী। মা ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, কষ্টসহিষ্ণু এবং দানশীলা। পড়াশোনা না জানলেও তাঁর এই তিনটি গুণ তিনি তাঁর পুত্র প্যারীচরণের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে নীতিকথামূলক গল্প বলে তিনি বালক প্যারীচরণকে নীতিশিক্ষা দিতেন। মায়ের শিক্ষা যে বিফল হয়নি, প্যারীচরণের পরবর্তী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তার সাক্ষ্য দেয়।

এ-যুগের মায়ের সঙ্গে সে-যুগের মায়েদের কত তফাৎ! এখনকার মায়েদের সময় কোথায় ছেলেদের নীতিগল্প শোনাবার? তখনকার ভাবনাহীন অবসর আজকের দিনে আর ফিরে আসবে না।

বাড়িতে বর্ণপরিচয় শেষ করে হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় ভর্তি হন প্যারীচরণ। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর ও অন্যান্য কয়েকজনকে নিয়ে কলকাতায় কয়েকটি পাঠশালা তৈরি করেন। এ-সবের তত্ত্বাবধায়ক ছিল কলকাতার 'স্কুল সোসাইটি' নামক একটি সংগঠন। এ স্কুলটি ঝামাপুকুর ও চোরবাগানের সন্ধিস্থলে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপর। স্কুলটিকে তখন বলতো 'স্কুল সোসাইটি'র স্কুল। পরে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নাম হয় 'কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল' এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরণের চেষ্টায় এর নাম 'হেয়ার স্কুল' হয়। হেয়ার সাহেবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্কুলটি চলতো বলে অনেকের কাছেই এর নাম ছিল 'হেয়ার সাহেবের পাঠশালা'।

এই পাঠশালায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হলেও নয়-দশ বছর বয়সে তাঁকে তাঁর বড়দার কাছে ঢাকায় চলে যেতে হয়। বড়দা

পার্বতীচরণ ঢাকার স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সেই স্কুলে প্রায় বছর খানেক পড়েছিলেন প্যারীচরণ। তারপর আবার কলকাতায় এসে হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় ভর্তি হন।

প্যারীচরণের বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল হেয়ার সাহেবের প্রত্যক্ষ সংসর্গে। এসময়ে বাইরে যা-কিছু তাঁর বিদ্যাশিক্ষা তা হেয়ার সাহেবের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। ফলে প্যারীচরণের ওপরে মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রভাব অত্যন্ত বেশিমাত্রায় পড়েছিল। হেয়ার সাহেবের সঙ্গে তাঁর ছাত্রদের সম্পর্ক এত মধুর ছিল, যা এযুগে কোনো শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে নেই! তিনি ছাত্রদের বাড়ি যেতেন, ছাত্ররাও তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতো। অসুস্থ ও দুস্থ ছাত্রদের চিকিৎসা করাতেন নিজের টাকা খরচ করে, দরিদ্র বালকদের বইপত্র কিনে দিতেন। কিন্তু তিনি তাঁর ছাত্রদের বিপথগামী দেখলে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকারের চেষ্টা করতেন। দেবচরিত্র গুরুর উপযুক্ত ছাত্র প্যারীচরণ। তাঁর লেখাপড়ায় অনুরাগ, স্বভাবের স্নিগ্ধ ভাব গুরু ডেভিড হেয়ারকে সব সময়ে আকর্ষণ করতো। ডেভিড হেয়ার মারা যান ১৮৪২-এ।

১৮৩৮-এ প্যারীচরণ হেয়ার স্কুল থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং আট টাকা বৃত্তি পান। এ-বছরেই তিনি হিন্দু কলেজে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। হিন্দু কলেজে এসেই তিনি ভালো ছাত্রদের মধ্যে একজন বলে গণ্য হন। তখন হিন্দু কলেজে বাংলা দেশের সব ভালো-ভালো ছাত্র পড়তেন। এখানে প্যারীচরণের সহপাঠী ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, মাধবচন্দ্র রুদ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র বহুভাষাবিদ্ আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, গুরুচরণ চক্রবর্তী, ভোলানাথ দত্ত প্রমুখ। মাধবচন্দ্র রুদ্র পরবর্তী কালে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে নাম করেছিলেন এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন হিন্দু কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতশাস্ত্রবিদ্। এঁদের সবার মধ্যে প্যারীচরণ ছিলেন

উৎকৃষ্ট ছাত্র। প্রতি বছর পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রাইজ পেতেন। সহপাঠীদের চোখে প্যারীচরণের স্থান ছিল অনন্য।

তাঁর এই কলেজেই অন্য এক প্রতিভাধর ছাত্র-বন্ধু ছিলেন। তাঁর নাম গোপালকৃষ্ণ ঘোষ। কলেজের এক অধ্যাপক একদিন বেকনের একটি রচনা পড়াচ্ছেন। কিন্তু ঠিক মতো অর্থ ধরতে পারছেন না একটি প্যাসেজের। ছাত্রদের জিজ্ঞেস করায়, কেউই ঠিক মতো বলতে পারলো না। তখন উঠলেন গোপালকৃষ্ণ। বললেন, স্যর, ছাপার ভুলে একটা জায়গার একটি ফুলস্টপ (বিরামচিহ্ন) অন্য জায়গায় বসে গেছে। ফলে প্যাসেজের মানে ঠিক মতো করা যাচ্ছে না। ফুলস্টপটি যদি ওখানে না ব'সে এখানে বসে তাহলে দেখুন, অর্থ ঠিক বোঝা যাচ্ছে। অধ্যাপক অত্যন্ত খুশি হলেন।—এমনই ছিলেন গোপাসকৃষ্ণ ঘোষ। গোপালকৃষ্ণ কিশোর বয়সেই মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে সুহৃদ্ প্যারীচরণের মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর এই সুহৃদের কথা উঠলেই বলতেন, গোপাল বেঁচে থাকলে, সে দেশের একজন হতো!

তখনকার শিক্ষাবিষয়ক বার্ষিক রিপোর্টে হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফল বিস্তারিতভাবে ছাপা হতো। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম, প্রশ্ন, পরীক্ষকের নাম ছাড়াও ভালো ছাত্রদের উত্তরগুলোও ছাপা হতো। যারা প্রাইজ পেত, সে-সব ছাত্রদের লেখা প্রবন্ধ হুবহু ছাপিয়ে দেওয়া হতো। যাঁরা পরীক্ষা করতেন তাঁদের মতামতও ছাপা হতো। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরণ তৃতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা দিলেন। প্রশ্নপত্রে তিনটি বীজগণিতের প্রশ্ন ছিল। অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। প্যারীচরণ ব্যতীত আর কেউ-ই ঐ তিনটি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর লিখতে পারেননি। সেজন্যে প্যারীচরণই সেবার প্রথম পুরস্কার পেলেন। ১৮৩৯-৪০-এর রিপোর্টে লেখা হলো: 'Hindoo College—3rd Class—In Algebra they were tried on 3 questions in quadratic equations. Pearychurn Sircar answered the 3

questions correctly and to him the Mathematical Prize was awarded'. এ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষাতেও তিনি অনেকগুলো প্রাইজ পেয়েছিলেন।

হিন্দু কলেজ পরিদর্শন করতে আসতেন সেকালের অনেক রাজ-প্রতিনিধি। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক, লর্ড অকল্যাণ্ড প্রমুখ গভর্নর-জেনারেল হিন্দু কলেজে এসে ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে। প্যারীচরণের সময়ে মেকলে, ক্যামিরন, মিলেট প্রমুখ বড়লাটের মন্ত্রীসভার সদস্য, এবং অ্যাডভোকেট-জেনারেল এডওয়ার্ড লায়াল, বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি হ্যালিডে সাহেব, ভারতীয় আইন কমিশনের সেক্রেটারি সাদারল্যাণ্ড, শিক্ষাসভার সম্পাদক ডাক্তার মৌএট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারি হিন্দু কলেজের শিক্ষকতার তত্ত্বাবধান করতেন। শুধু তাই নয়, এঁরা ছাত্রদের পরীক্ষাও নিতেন।

একদিন মেকলে (Thomas Babington Macaulay) প্যারীচরণের ক্লাসের ছাত্রদের পরীক্ষা করতে এলেন। প্যারীচরণের বাল্যকাল থেকেই স্বভাব ছিল, বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকলে তাঁর ঘুম পেয়ে যেত। স্বভাবতই সেদিন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে ক্লাসে বসে ঢুলছেন তিনি। মেকলে এলেন। সবাই নড়েচড়ে বসলো। প্যারীচরণের চোখ থেকে আর ঘুম যায় না। এক-একবার চোখ তুলে তাকান সাহেবের দিকে, পরক্ষণেই আবার ঘুমে ঢুলতে থাকেন তিনি। মেকলে তাঁর কাছের ছেলেটিকে একটি প্রশ্ন করলেন। ছেলেটি পারলো না। আঙুল তুলে সাহেব পর-পর জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন —next, next—কেউই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না। তন্দ্রাচ্ছন্ন প্যারীচরণের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, you boy। চোখমুছে দাঁড়ালেন প্যারীচরণ। গড়-গড় করে নির্ভুল উত্তর বলে গেলেন তিনি। অবাক্ মেকলে। তিনি ভেবেছিলেন, যে-ছেলে ঘুমোচ্ছে সে তো অমনোযোগী হবেই। অতএব ঠিকমতো উত্তর সেও দিতে পারবে না। এগিয়ে গেলেন মেকলে প্যারীচরণের দিকে।

বললেন, 'I see, this boy is like our Manchester weaver'. অর্থাৎ 'ম্যানচেস্টারের তাঁতীদের মতো এই ছেলেটি।' ম্যানচেস্টারের তাঁতীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েও হাতের কাজ অর্থাৎ তাঁত চালানোর কাজ নিখুত ভাবে করে যায়। চোখে ঘুম থাকলে কি হবে? ঘুমের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে প্যারীচরণের মাথা।

তখনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সৃষ্টি হয়নি। জুনিয়র ও সিনিয়র পরীক্ষা ছিল। প্যারীচরণেরও আগে থেকে হিন্দু কলেজের সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের প্রশংসাপত্র দেওয়া হতো, কিন্তু তখনও সিনিয়র স্কলারশিপের প্রবর্তন হয়নি। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন শিক্ষা-সভা ছাত্রদের আরও উৎসাহ দেবার জন্যে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। এই পরীক্ষা দিয়েও প্যারীচরণ মোট চৌদ্দজন ছাত্রের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন এবং বৃত্তি পেলেন মাসিক চল্লিশ টাকা। ১৮৪১, ১৮৪২ ও ১৮৪৩ সালের পরীক্ষায়ও প্যারীচরণ ফার্স্ট। এসময়ে মধুসূদন দত্ত দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে কেবল মাত্র ইংরেজি সাহিত্যে পরীক্ষা দিয়ে পঞ্চাশ নম্বরের মধ্যে তিরিশ পেয়েছিলেন। ঐবিষয়েই প্যারীচরণ পান সাতচল্লিশ নম্বর!

জুনিয়র পরীক্ষার পর থেকেই ঘটনাচক্রে প্যারীচরণকে তাঁর মামার বাড়ি চোরবাগানের গোকুলচন্দ্র বসুর বাড়িতে বাস করতে হয়। সেদিন থেকে এ-বাড়িটি হয়ে উঠেছিল সরস্বতীর পীঠস্থান। কৃতবিদ্য নামী সব ব্যক্তি আসতেন প্যারীচরণের কাছে। নানা রকম শিক্ষা-আলোচনা চলতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঝামাপুকুরের তারকনাথ ঘোষ হিন্দু কলেজের রত্নবিশেষ ছিলেন। এই বাড়ির আর একজন মনীষী, প্যারীচরণের সম্পর্কে মাতুল-পুত্র কৈলাশচন্দ্র বসু—এঁরা সব সময়ের সঙ্গী ছিলেন প্যারীচরণের। হিন্দু কলেজের সর্বোচ্চ প্রাইজ পেয়ে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি কলেজ ত্যাগ করেন।

হিন্দু কলেজ থেকে বিদায় নেবার সময় কলেজের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাসভার সদস্যগণ প্যারীচরণকে প্রথম শ্রেণীর সিনিয়র স্কলারশিপ পাওয়ার জন্যে সার্টিফিকেট দেন। তাতে তাঁর অঙ্কশাস্ত্র ও ইংরেজি

ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হয়। '....that he has made highly creditable progress in Mathematics, and acquried remarkable proficiency in the English Language and literature....'.। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক এবং তৎকালীন হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডি. এল. রিচার্ডসন বলেছিলেন, 'তাঁর (প্যারীচরণের) ছাত্রোচিত সৎ আচরণ, পাঠে অভিনিবেশ এবং সুউচ্চ প্রতিভার জন্যে প্যারীচরণ ছিলেন আমাদের সবার প্রিয়।' '....He was always distinguished himself by the propriety of his general conduct, by his attention to his studies, and by the superiority of his talents.' কলেজের গণিতের অধ্যাপক ভি. এল. রীজ বলেছিলেন, 'অঙ্কশাস্ত্রে প্যারীচরণ ছিলেন অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন।'

পনেরো বছর বয়সে প্যারীচরণ পিতৃহীন হন। সংসারের অবস্থা এমন কিছু সচ্ছল ছিল না। পিতা ভৈরবচন্দ্র মৃত্যু-সময়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য কোনো সংস্থানও রেখে যেতে পারেননি। হেয়ার স্কুলে পড়ার সময়েই তিনি অত্যন্ত আর্থিক সংকটে পড়েন। সম্বল মাত্র স্কলরাশিপের টাকা ক'টি। তাঁর ধনী বন্ধুরা যে-সব কলম ব্যবহারের অযোগ্য বলে ফেলে দিতেন সেগুলি নিয়ে এসে প্যারীচরণ লেখার কাজ সারতেন। গায়ের উড়ানি কেটে দু' টুকরো করে আধ ভাগ গায়ে দিয়ে কাজ সারতেন। তাছাড়া তাঁর জীবনে আর এক অঘটন ঘটলো। পিতার মৃত্যুর পরে তাঁর বড় জ্যেঠার ছেলে প্যারীচরণদের সম্পত্তির অংশ দিতে রাজি হলেন না। ফলে এঁরা বাস্তুচ্যুত হলেন। মা এবং ভাইদের হাত ধরে উঠলেন চোরবাগানে মামার বাড়ি। সেখানেই মাতামহের প্রদত্ত অংশে এঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

অবশ্য এ-দুরবস্থা চারিত্রিক দৃঢ়তায় অচিরেই তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর প্যারীচরণ হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে আশি টাকা বেতন দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে চাকরি পেলেন। এখানে দু'বছর শিক্ষকতা করে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর তিনি দেড় শ' টাকা বেতনে বারাসত গভর্নমেণ্ট স্কুলে হেডমাষ্টারের পদে বৃত হলেন। তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। পরবর্তীকালে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক (আট বছর কাল), প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথমে অস্থায়ী ও পরে স্থায়ী অধ্যাপক-পদে আমৃত্যু কাজ করেন। ইডেন হিন্দু হোষ্টেল স্থাপন তাঁর অনেক সদনুষ্ঠানের মধ্যে একটি।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর প্যারীচরণের মৃত্যু হয়।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ১৮২৪ ॥ মৃত্যু : ১৮৬১

মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের জীবন হরিশ্চন্দ্রের। বাংলায় সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে এক অসাধারণরূপে উল্লেখযোগ্য এই নামটি। এত অল্পসময়ে এত বেশি কাজ করে যাওয়া বোধকরি অসামান্য প্রতিভাশালী এবং কঠোর উদ্যোগী না হলে কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। নীলকর-প্রজাদের অকৃত্রিম বন্ধু, দরিদ্র কৃষকদের ত্রাণকর্তা ও সমাজ-সংস্কারক হরিশ্চন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত সরল ও আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ। দারিদ্র্যের কঠিন পীড়ন তিনি বাল্যকাল থেকেই সহ্য করে এসেছেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা সম্পাদনকালেও তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে সমানভাবে লড়াই করেছেন। বাংলার নীলচাষীদের ওপর নীলকর-সাহেবদের যে অকথিত অত্যাচার চলতো, তার প্রতিবাদ ও প্রতিকার করতে গিয়ে তিনি বহুবার ব্রিটিশ সরকারের বিরাগ-ভাজন হয়েছেন, তবুও তাঁর আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। তাই বোধকরি হরিশের মৃত্যুতে বিখ্যাত 'নীল-দর্পণ'-এর লেখক দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন :

'…আশা ফলবতী হয়, অসাধ্যসাধন,
নিরুপায় হরিশ যতন সহকারে
লভিল বিপুল বিদ্যা কষ্টে অনাহারে,
লোকযাত্রা নির্বাহের হল সমাধান,
আরম্ভিল প্যাট্‌রিয়ট, দেশের কল্যাণ,

হরিশ উঠিল বেড়ে বিদ্যার প্রভায়,
বঙ্গকুল চূড়ামণি, দীনের উপায়,
প্রজার পরম বন্ধু অতিহিতকর,
ভারত ভরিত যশে, হল সমাদর,
হরিশের লেখনীর জোর বিজাতীয়
প্যাট্রিয়ট্ দেশে দেশে হল বরণীয়,
বেড়ে গ্যাল কলেবর, বিভব বাড়িল,
বিলাতে বিলাতবাসী গণ্য বলে নিল,
মরেছে হরিশ দেশ ভাসিয়াছে শোকে,
ভাল লোক হলে বুঝি থাকে না এ-লোকে?'

তখন ভবানীপুর কলকাতার অংশ ছিল না। ছিল সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত। ভবানীপুর কলকাতার অন্তর্ভুক্ত হলো ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। একই সঙ্গে কলকাতার অন্তর্ভুক্ত হলো বেনিয়াপুকুর, টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল। এই ভবানীপুর পল্লীতে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুলাই। হরিশ্চন্দ্রের পিতার নাম রামধন মুখোপাধ্যায়, মাতা রুক্মিণী দেবী। হরিশচন্দ্রেরা দু'ভাই। তাঁর বড় ভাইয়ের নাম হারাণচন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রের যখন ছ'মাস বয়স, তখন তাঁর বাবা মারা যান।

দরিদ্র-ঘরে জন্মগ্রহণ করে হরিশ্চন্দ্রের বাল্যকাল কেটেছে অত্যন্ত আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্য দিয়ে। তাঁর দারিদ্র্যের কথা নিজে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলতে কোনো দিন সংকোচ বোধ করেননি তিনি।

বাল্যকালে ভবানীপুর-পল্লীর এক পাঠশালায় ভর্তি হলেন হরিশ্চন্দ্র। অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি পাঠশালায় পড়ার সময়ে। ইংরেজি শেখার মূলে ছিলেন তাঁর দাদা হরিশ্চন্দ্র। তিনিই ছোট ভাইকে বাড়িতে পড়াতেন। এর পর, হরিশ্চন্দ্রের যখন সাত বছর বয়স তখন তিনি পাঠশালার পাঠ শেষ করে ভর্তি হলেন ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুলে। এই স্কুলটি পরিচালনা

করতো তখনকার 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি'। ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২ খ্রী.) ছিলেন এই সোসাইটির অন্যতম সদস্য।

স্কুলে তো ভর্তি হলেন হরিশ, কিন্তু স্কুলের বেতন জোগাবেন কোত্থেকে ? দু'বেলা দুটো আহারের সংস্থানই হয় না, তার ওপর লেখাপড়া করার টাকা কোথায় ? স্কুলের এক সাহেব-মাস্টার রেভারেণ্ড পেফার্ড (Rev. Pefard) হরিশের পাঠের প্রতি মনোযোগ দেখে বললেন, না হরিশ, তোমাকে স্কুলের বেতন দিতে হবে না। ফ্রি স্টুডেণ্ট হয়ে তুমি এ-স্কুলে পড়বে।

বেঁচে গেলেন হরিশ। ক্লাশের পড়া শেষ করে বাইরের ইংরেজি, বাংলা—যে-বই পেতেন পড়ে শেষ করে ফেলতেন তিনি। ফলে পাঠস্পৃহা তাঁর দিন দিন বেড়ে যেতে লাগলো। হাতে কিছু পয়সা এলেই হরিশ বই কিনতেন। তখন তো আজকের মতো বাংলা বই অত বেশি ছিল না, তাই ইংরেজি বইয়ের প্রতি তিনি বেশি আকৃষ্ট হলেন।

হরিশের স্বাস্থ্য ছিল ভালো। মনে যেমন ছিল সাহস তেমনি তাঁর দেহে ছিল বল। সব সময়ে মুখের হাসি কখনো কেড়ে নিতে পারেনি তাঁর আর্থিক অ-স্বাচ্ছন্দ্য।

তখন তো গোরাদের রাজত্ব। গোরা সৈন্যেরা নিরীহ পথচারীদের ওপর যখন-তখন অত্যাচার করতো। এটা প্রায় যেন তাদের খেলার মতো হয়ে গিয়েছিল। একদিন ভবানীপুরের রাস্তায় হরিশ দেখলেন কতকগুলো গোরা মাতাল পথচারীদের মারধোর করছে। বেশ-কিছু স্কুলের ছাত্র-সঙ্গী জোগাড় করলেন তিনি। তারপর আরম্ভ করলেন মাতাল-গোরা ঠেঙাতে। তারা তো মার খেয়ে পগার পার। এর পর থেকে আর কোনো দিন ঐ পল্লীতে ঢুকে গোরারা পথচারীদের ওপর অত্যাচার করতে সাহস করেনি। পরবর্তীকালে এই মানসিক শক্তি নিয়ে নিপীড়িত দরিদ্র ভারতবাসীর হয়েই লড়াই করে গেছেন ইংরেজের বিরুদ্ধে। হাতে ছিল প্রধান অস্ত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা।

স্কুলে পড়ার সময়েই তিনি ইংরেজি লেখায় এমন পারদর্শী হয়ে

উঠেছিলেন যে, নানা লোকের বিভিন্ন ধরনের ইংরেজি দরখাস্ত লিখে দিয়ে কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন। তাতে দাদার আয়ের সঙ্গে এই অর্থ ক'টিতে সংসারের উপকার হয়তো কিছুটা হতো, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে আয় কিছুই নয়।

একদিন, বাড়িতে একটি কণাও চাল নেই। হাঁড়ি চড়বে না। হরিশ একটি কাঁসার থালা বন্ধক দিয়ে কিছু চাল কিনবেন মনে করে থালা-হাতে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন, এলো মুষল-ধারে বৃষ্টি। বর্ষাকাল। কখন বৃষ্টি থামবে কেউ জানে না।

হরিশ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন বারান্দায়। তবে কি আজ পরিবারের সবাই উপোসী থাকবে। বাড়িতে এমন একটি ভাঙা ছাতাও নেই যা মাথায় দিয়ে তিনি রাস্তায় বেরুতে পারেন।

ঠিক সেই সময়েই পাড়ার এক মোক্তারবাবু তাঁর মক্কেলকে সঙ্গে নিয়ে হরিশের বাড়িতে এসে হাজির।

কী ব্যাপার? এখনই এই নথিটাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতে হবে।

হরিশ কাগজ-কলম নিয়ে লেগে গেলেন ডকুমেন্ট-টাকে অনুবাদ করতে। মোক্তার এর আগেও এই বালক-হরিশকে দিয়ে এমন সব নথি বেশ কয়েকবার অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন এবিষয়ে হরিশের পারদর্শিতার কথা।

মাত্র কয়েক মিনিট লাগলো অনুবাদ করতে। মোক্তারবাবু খুশি হয়ে দু' টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে চলে গেলেন।

ঈশ্বরে-বিশ্বাসী হরিশ্চন্দ্র হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। বৃষ্টি ধরে গেলে ঐ টাকা দিয়ে চাল কিনে আনলেন।

কিন্তু এই অনিশ্চয়তার টাকা আঁকড়ে ধরে কতদিন চলবে? ইউনিয়ন স্কুলের পড়াও শেষ। চেষ্টা করতে লাগলেন হিন্দু স্কুলের সিনিয়র বিভাগে ভর্তি হবার জন্যে। যদি বিনা বেতনে এখানে পড়ার সুযোগটা পেয়ে যান তাহলে হয়তো পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারবেন। তখনকার দিনে 'ফাউনডেশন স্কলার' হিসেবে হিন্দু

স্কুলে দরিদ্র ছাত্র বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ পেত। কিন্তু ঐ-সব ছাত্রদের নাম সুপারিশ করতে পারতেন কেবলমাত্র ঐ ফাউন্ডেশনে যাঁরা অর্থ সাহায্য করেন, তাঁরা বা তাঁদের উত্তরাধিকারীরা। এমন লোকের সঙ্গে তো হরিশের কোনো পরিচয়ই নেই। তাহলে? এমন কি কেউ নেই যিনি হরিশের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে এই অর্থ-সাহায্যকারীর কোনো একজনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন? একবার মনে হয়েছিল, ইউনিয়ন স্কুলের অন্যতম সদস্য ডেভিড হেয়ারের কথা। যদি হেয়ার সাহেবকে ধরা যায় তাহলে সুরাহা হতে পারে।

কিন্তু হেয়ার সাহেবকে ধরা অত সহজ নয়। দারুণ কর্মব্যস্ত লোক। বাড়িতে উমেদার ব্যক্তিদের লাইন। সবাই 'পুওর বয়'। ওখানে উমেদারি করার মতো অভিভাবক তাঁর কোথায়?

অন্য আর একটা ব্যবস্থা আছে। হেয়ার সাহেবের পালকির পেছনে পেছনে 'মি পুওর বয় স্যর' বলতে বলতে ছুটতে পারলে হয়!

এই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালকের এ-ব্যবস্থায় অংশ-গ্রহণে মনে ওঠেনি। তাছাড়া সংসারের জন্যে এখনই কিছু টাকা-পয়সার ব্যবস্থা না করতে পারলে চলবে না। তাই কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় চাকরির চেষ্টা করতে লাগলেন। বয়স তখন তাঁর চৌদ্দ-পনেরো।

অবশেষে ডালহৌসি-স্কোয়ারে টুলো অ্যাণ্ড কোম্পানিতে মাসিক দশটাকা বেতনে হরিশ একটি চাকরি পেলেন। চাকরিটি পেয়ে তিনি তখন নিজের চেষ্টায় বিদ্যার্জনে মন দিলেন।

হরিশ পড়াশোনায় মন দিয়ে। প্রথমেই তিনি 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি'তে ভর্তি হলেন। চাঁদা মাসিক দু'টাকা। এই গ্রন্থাগারটি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩ নং এসপ্লানেড রোডে। পরে এটি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হেয়ার ষ্ট্রীটে অবস্থিত মেটকাফ্ হলে উঠে আসে। এই 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি' ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি'র সঙ্গে যুক্ত হয়। স্বাধীনতার পর 'ন্যাশান্যাল লাইব্রেরি' বা 'জাতীয় গ্রন্থাগার' নামে আলিপুরে চলে

যায়। যাহোক, গ্রন্থাগারের কাছাকাছি হরিশের অফিস। তাই অফিস ছুটির পরই তিনি চলে আসতেন এই গ্রন্থাগারে। দেশ-বিদেশের ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সাহিত্য সবকিছুই তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়তেন।

এ সময়ে পড়াশোনা ছাড়াও কলকাতার যেখানেই ভালো বক্তৃতা হতো সেখানেই তিনি বক্তৃতা শুনতে যেতেন। আগেই বলেছি, তিনি ছোটবেলা থেকেই আইন-সংক্রান্ত নথিপত্র অনুবাদ ও দরখাস্ত ইত্যাদি লিখতেন। ফলে বাল্যকালেই হরিশ আইনের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই আইনের প্রতি আগ্রহই তাঁকে টেনে নিয়ে যায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত (১৮২০--১৮৬৭)-এর কাছে। শম্ভুনাথ হরিশের থেকে বয়সে বছর চারেকের বড়। তাছাড়া ভবানীপুরেই হরিশের বাড়ির কাছাকাছিই তাঁর বাস। তিনি হরিশকে অত্যন্ত স্নেহও করতেন। ফলে শম্ভুনাথের বাড়িতে প্রায়ই হরিশ যাতায়াত করতেন। শম্ভুচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতি। এঁর বাড়িতে তখনকার দিনের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আসতেন। তাঁরা যুবক হরিশের আইন-বিষয়ক কথাবার্তা শুনে বিস্মিত হতেন।

হরিশ্চন্দ্র টুলো কোম্পানির চাকরি ছেড়ে মিলিটারি জেনারেল অফিসে 'কপি রাইটার' পদে (১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে) কাজ করেন। বেতন পঁচিশ টাকা। এত দক্ষতার সঙ্গে তিনি এই কাজটি করতেন যে কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর বেতন হলো এক শ' তিরিশ টাকা। উন্নীত হলেন 'কপি রাইটার' থেকে ক্লার্ক-এ।

জীবনের নানান সংঘাতের মধ্যে দিয়ে হরিশ্চন্দ্রের চরম সার্থকতায় পৌঁছানো একটা বিরাট ইতিহাস। এই সার্থকতার সর্বোচ্চ সোপান হলো 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (প্রথম প্রকাশ : ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জানুআরি) তাঁর সম্পাদনায় এই ইংরেজী পত্রিকাটি ভারতের সর্বত্র সুনাম পেয়েছিল। নীল-বিদ্রোহে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে দেশের মঙ্গলকামনাই আমৃত্যু করে গেছেন তিনি।

রাজনারায়ণ বসু

জন্ম : ১৮২৬ ॥ মৃত্যু : ১৮৯৯

চব্বিশ পরগনা জেলার মাগুরা পরগনার বোড়াল গ্রাম। সেখানে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ বসুর জন্ম। এঁদের পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল কলকাতার গড়-গোবিন্দপুরে। ইংরেজরা যখন গোবিন্দপুরে (ফোর্ট উইলিয়াম) কেল্লা নির্মাণ করে তখন তারা রাজনারায়ণের পূর্বপুরুষদের কলকাতার বাহির-সিমলায় জমি দিল গোবিন্দপুরের জমির বিনিময়ে। সেখানে থেকে রাজনারায়ণের ঠাকুরদা বোড়াল গ্রামে জমি কিনে নিজে বাড়ি তৈরি করেন। কিন্তু বোড়াল গ্রাম ছেড়ে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈদ্যনাথে (দেওঘর) বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে থাকেন এঁরা।

রাজনারায়ণের পিতা নন্দকিশোর বসু কিছুদিন রামমোহন রায়ের সেক্রেটারির কাজ করেছেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে চাকরি করেন। ১৮৪৫-এর ৭ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন রামমোহন রায়ের ভক্ত ও শিষ্য। এছাড়াও বাল্যকালে রাজনারায়ণ শিবপূজা করতে ভালোবাসতেন। পূজা করার জন্যে এ-পূজা নয়, এ-পূজা ছিল তাঁর খেলার অঙ্গ। শিবের সামনে কুমড়ো বলি দিতেন। এও একটা খেলা। বড়রা নিষেধ করলেও শুনতেন না।

রাজনারায়ণের প্রথম শিক্ষা শুরু হয় চাণক্যশ্লোক মুখস্থ করে। সঙ্গে সঙ্গে চলতো বাল্মীকির রচিত শ্লোক : মা নিষাদ···। আর ইংরেজি শব্দের অর্থ মুখস্থ করা : গড—ঈশ্বর, লর্ড—ঈশ্বর, আই—আমি, ইউ—তুমি ইত্যাদি।

সাত বছর বয়সে গ্রাম থেকে রাজনারায়ণকে কলকাতায় আনা হলো। বাবা নন্দকিশোর ছেলেকে প্রথম ভর্তি করে দিলেন গুরুমশাইয়ের এক পাঠশালায়। কিছুদিন পরে ইংরেজি শেখানোর জন্যে বৌবাজারে শম্ভু মাস্টারের স্কুলে। তিনি এ-সম্বন্ধে লিখেছেন: 'এই স্কুল বৌবাজারের একটি ছোট অন্ধকার ঘরে হইত। ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। শম্ভু মাস্টার অতি অল্পই ইংরেজি জানিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন ও তাহার নাসিকার উপর চন্দনের এক দীর্ঘ তিলক ধারণ করিতেন। তিনি অপরাহ্ণে স্কুলে আসিয়া পড়াইতেন। পূর্বাহ্ণে গ্রিফ সাহেব আসিয়া পড়াইতেন। গ্রিফ সাহেব শম্ভু মাস্টারের অপেক্ষাও ইংরাজি অল্প জানিতেন। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়? একটি লাল মুখ থাকিলে যেমন স্কুলের গুমর বাড়ে, এমন আর কিছুতেই নহে। ভুল করিলে ইহাঁরা ফ্রেল দ্বারা ছাত্রের হাতে মারিতেন। অনেক দিন অবধি ফ্রেল শব্দের ব্যুৎপত্তি কি জানিতে পারি নাই; পরে একদিন লাটিন ভাষার অভিধান দেখিতে দেখিতে Ferula শব্দ পাইলাম। উহা একটি কাঠের চাকতি, মস্ত বাঁটওয়ালা। উহা রোমানদিগের দ্বারা ও সেকালের ইংরাজদিগের দ্বারা ছাত্রকে দণ্ড দিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।'

শম্ভু মাস্টারের স্কুলে কিছুদিন পড়ার পর রাজনারায়ণ ভর্তি হলেন কলুটোলার হেয়ার সাহেবের স্কুলে। তখনকার সময়ে হেয়ার সাহেবের স্কুলের নাম ছিল 'স্কুল সোসাইটিস্ স্কুল'। স্কুল সোসাইটির স্কুল হলেও প্রকৃতপক্ষে স্কুলের কর্তা ছিলেন ডেভিড হেয়ার। সবাই তাই ঐ স্কুলকে 'হেয়ার সাহেবের স্কুল' বলতো। হেয়ার সাহেব সম্বন্ধে রাজনারায়ণ লিখেছেন: 'বাঙালিরা ময়লা জানিয়া, যাহাতে বাঙালি বালকেরা পরিষ্কার থাকিতে যত্নবান হয়, তজ্জন্য হেয়ার সাহেব মধ্যে মধ্যে স্কুলের ছুটি হইবার সময়ে স্কুলের ফটকে একটি তোয়ালিয়া ও বেত হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। প্রতি বালকের গা তোয়ালিয়া দ্বারা কষে ক্ষণেক রগড়াইতেন। যদি ময়লা বেরোত, তাহা হইলে তাহাকে দুই এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন। তিনি

বালকদিগকে গা পরিষ্কার করিবার জন্য সাবান দিতেন। প্রতি শনিবার তাঁহাকে হাতের লেখা দেখাইতে হইত। তিনি লিখিবার বিষয় যেসকল উপদেশ দিতেন, সেইরূপ না লিখিলে দুই এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন। তিনি একটি অক্ষর বড় ও একটি অক্ষর ছোট হইলে বড় রাগ করিতেন। আমার ভাগ্যক্রমে কখন তাঁহার নিকট হইতে বেত খাই নাই।'

কেবলমাত্র ডেভিড হেয়ার নন, রাজনারায়ণ তাঁর অন্যান্য শিক্ষকদের সম্বন্ধেও সুন্দরভাবে বলেছেন। 'হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে যখন আমি পড়ি, তখন আমাদিগের তিন জন শিক্ষক ছিলেন। এক জনের নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এক জনের নাম উমাচরণ মিত্র, তৃতীয়ের নাম রাধামাধব দে। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। ইনি পরে কলিকাতার এক জন প্রসিদ্ধ ডাক্তার হইয়াছিলেন। উমাচরণ মিত্র জনাই নিবাসী ছিলেন। রাধামাধবের বাটী কলিকাতার চাঁপাতলায় ছিল। উমাচরণ হেডমাষ্টার ছিলেন। দুর্গাচরণের নিকট আমরা কত উপকৃত তাহা বলিতে পারি না। তিনিই আমাদিগের মনে জ্ঞানের ইচ্ছা এবং অনুসন্ধানের ইচ্ছার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের মনোমুকুলকে প্রথম প্রস্ফুটিত করেন। দোষের মধ্যে এই যে, তিনি আমাদিগের নিকট সংশয়বাদ প্রচার করিতেন। পরকাল নাই এবং মনুষ্য ঘটিকা-যন্ত্রের ন্যায়, এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে যদি উমাচরণ আসিতেন, তাহা হইলে বলিতেন, Let us stop for a while, Umacharan is coming. উমাচরণ আস্তিক ছিলেন, তিনি সংশয়বাদ ভালোবাসিতেন না। উমাচরণ আমাদিগের নিকট Scott's Ivanhoe, Pope's Poem, Prior's Henry to Emma এবং অন্যান্য গদ্য-পদ্য কাব্য আমাদিগের নিকট উত্তমরূপে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের মনে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ঐ সকল কাব্য পড়িতেন, তাহা কখন ভুলিবার নহে। যে-সকল গদ্য-পদ্য কাব্য তিনি আমাদিগের

নিকট পড়িতেন, তাহা ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া। একালের কোনও শিক্ষক কি এরূপ করিয়া থাকেন? আর করিবারও জো নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী দ্বারা হস্ত পদ বাঁধা।

রাধামাধব আমাদিগকে গণিত শিখাইতেন। চিরকালই আমি গণিত-বিদ্বেষী। গণিতের পুস্তক দেখিলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। এই রোগকে গণিতাতঙ্ক রোগ বলা যাইতে পারে। উহা জলাতঙ্ক রোগের ন্যায়। গণিতের মধ্যে বীজগণিতের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। গণিতের প্রতি অমনোযোগ দ্বারা রাধামাধবের মনে কতই না কষ্ট দিয়াছি।'

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ হেয়ার সাহেবের স্কুল থেকে পাশ করে হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন। সে-সময়ে যেসব ছাত্র হেয়ার স্কুল থেকে 'হিন্দু'তে (পরবর্তীকালে হিন্দুকলেজের নাম হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ) আসতো, তারা বিনা বেতনে পড়তে পেত। হেয়ার সাহেব বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষার পিতা বলেই তাঁর সম্মান রাখতে বোধকরি 'হিন্দু'-র অধ্যাপকরা এসব ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতেন না। কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ধনীর সন্তান। আর হেয়ার স্কুলের সব গরিব। এদের প্রতি কেমন যেন তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠতো 'হিন্দু'র ছাত্রদের আচার-ব্যবহারে। 'হিন্দু'-ছাত্রেরা এদের নাম দিয়েছিল 'বড়ে'। এরা নাকি শুধু বড়ি-ভাতে দিয়ে ভাত খেয়ে কলেজে আসতো। অর্থাৎ ধনী ছাত্রদের কাছে এরা ছিল হাস্যাস্পদ।

কিন্তু নতুন যে-ছেলেটি এসে 'হিন্দু'তে ভর্তি হলেন? তিনি দরিদ্র তো বটে, কিন্তু নারায়ণেরও রাজা। রাজনারায়ণ। এখানে থার্ড ক্লাসে ভর্তি হলেন তিনি। প্রথম বছরেই কিন্তু তার সহপাঠীদের চোখ ছানাবড়া। মিলটনের কাব্য পরীক্ষা করে নিয়ে ডকটর ওয়াইজ রাজনারায়ণকে সর্বোচ্চ নম্বর দিলেন। সমস্ত পরীক্ষার ফল এত ভালো হলো যে, অনেকগুলি বই প্রাইজ পেলেন। তারপর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে ভালো উত্তরের জন্যে তিরিশ টাকার সিনিয়র স্কলারশিপ

পেলেন। সহপাঠীরা তো তখন রাজনারায়ণের সঙ্গে ভাব করতে ব্যস্ত। গরিব! তাতে কি হয়েছে, এমন ছাত্র আর হয় না। তাঁর সহাধ্যায়ীদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র দেব ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ছিলেন অন্যতম। অবশ্য মধুসূদন দত্ত সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ার সময়ে খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং বিশপ্‌স কলেজে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে এঁরা সবাই এক-এক জন বিখ্যাত ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

তিরিশ টাকা মাসিক বৃত্তি দু'বছর ধরে পেয়েছিলেন রাজনারায়ণ। তার পরের দু'বছর চল্লিশ টাকা করে। তখনকার দিনে সর্বোত্তম ছাত্রদের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতো। আর প্রাইজ দিতেন গভর্নর-জেনারেল, টাউন হলে সভা করে। দু'একবার রাজনারায়ণ সাহিত্য, পুরাবৃত্ত এবং ধর্মনীতিতে ভালো ফল করার জন্যে মেডেল ও পুরস্কার পেয়েছেন। পুরাবৃত্ত লেখকদের মধ্যে রাজনারায়ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল গিবন ও মেকলে। কবিদের মধ্যে ছিলেন স্পেনসর, টমসন, বায়রণ। সেক্সপীয়র ও মিলটনকেও তাঁর ভালো লাগতো।

ক্যাপটেন রিচার্ডসন (Captain David Lester Richardson) সে-সময় হিন্দু কলেজে ইংরেজি পড়তেন। রিচার্ডসন সাহেব ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন। তাঁর কাছে সেক্সপীয়র পড়ে সব ছাত্রই সেক্সপীয়রকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তিনি খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ভালো আবৃত্তি শেখার জন্যে সব ছাত্রকেই নাট্যশালায় গিয়ে নাটক দেখা দরকার। ভালো আবৃত্তি শেখার জায়গা হলো নাট্যালয়। পরবর্তী কালে রিচার্ডসন সাহেব প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন। এছাড়া আরও বিখ্যাত অধ্যাপকের কাছে পড়েছেন রাজনারায়ণ। বাল্যকালেই যেমন তিনি ঐতিহাসিকরূপে

নাম করেছিলেন, তেমনি ভালো আবৃত্তিকার রূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করেন। 'তাঁর দারুণ অসুখের জন্যই তাঁকে কলেজ পরিত্যাগ করতে হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়সে কুড়ি বছর।

রাজনারায়ণ অসাধারণ মমতার সঙ্গে সারাটি জীবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাঁর লেখা 'সেকাল আর একাল' (১৮৪৭), 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮), 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩), 'ধর্মতত্ত্ব দীপিকা' : ১ম ভাগ (১৮৬৬) ও ২য় ভাগ (১৮৬৭), 'ব্রহ্মসাধন' (১৮৬৫) প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষকরূপে রাজনারায়ণ খুব নাম করেছিলেন। ১৮৪৯-এ তিনি সত্তর টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে তিনি যে কেবল ক্লাসের ছাত্রদেরই পড়াতেন তা নয়, এখানে তাঁর কাছে ইংরেজি পড়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। রামগতি ন্যায়রত্নও রাজনারায়ণের ছাত্র ছিলেন।

প্রায় দু'বছর সংস্কৃত কলেজে কাজ করে রাজনারায়ণ ১৮৫১-তে মেদিনীপুর সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন শিক্ষকতার প্রকৃত জীবন তাঁর এই মেদিনীপুরেই শুরু হয়। এখানে প্রায় আঠারো বছর শিক্ষকতা করেছিলেন তিনি। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। মেদিনীপুর জেলা স্কুলের সর্বপ্রকার উন্নতি, মেদিনীপুরে ব্রাহ্মসমাজের পুনরায় প্রতিষ্ঠা, সেখানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কার্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করেছিলেন। মেদিনীপুর-বাসীও তাঁদের এই একান্ত আপন-জন রাজনারায়ণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বেঁধে ফেলেছিলেন। এমন কি, তাঁর কৃতি ছাত্রেরা গুরুভক্তির চিহ্নস্বরূপ একটা বাড়ি তৈরি করে রাজনারায়ণকে উপহার দিয়েছিলেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

জন্ম: ১৮২৭ ॥ মৃত্যু: ১৮৯৪

সেকাল ছিল আলাদা। ভালো ছেলে তৈরি করতে বাপ-মা তখনকার দিনে তাঁদের ছেলেদের কখনই তিন-চার বছর বয়সেই স্কুলে পাঠাতেন না। ছেলেকে সকল বিষয়ে পণ্ডিত বানাতে গিয়ে সেযুগে কোনো বাপ-মাই রাশীকৃত বইয়ের মাঝে ছেলেকে বসিয়ে রাখতেন না। শিক্ষা শুরু হতো মা, বাবা বা ঠাকুরদার কোলে বসে। আধো-আধো উচ্চারণে শিশুরা শিখতো অনেক সংস্কৃত শ্লোক বা ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও অ, আ, ক, খ শেখার আগেই মুখস্ত করে ফেলেছিলেন—আদি কবির প্রথম শ্লোক 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। এবং এ-সবের শিক্ষাগুরু ছিলেন ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ।

ছোটবেলায় অত্যন্ত রুগ্ণ ছিলেন ভূদেব। কলকাতার হরিতকী বাগানে তাঁদের প্রতিবেশী ছিল তখন সমাজের নীচুজাতের লোক। প্রায়ই জ্বরজারি, পেটের অসুখ লেগেই থাকতো ভূদেবের। ফলে প্রতিবেশীরা ভূদেবের মাকে বলতো, তোমার ছেলেকে ডাইনিতে পেয়েছে, ওকে ওঝা দেখিয়ে ঝাড়-ফুঁক কর। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত তাঁর বাবা কিন্তু এসব পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না। তবুও প্রতিবেশীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। ঝাড়-ফুঁকে বিশ্বাস না থাকলেও তিনি পূজা-আচ্চার সুফল স্বীকার করতেন। আর ভূতঝাড়ানোর আনুষঙ্গিক যে পূজা, এতে তিনি আপত্তি করবেন কেন?

এতটুকু ছেলে ভূদেব। তাকে ঝাড়াবার জন্যে একদিন ব্রাহ্মণ-ওঝা এলো। ঘট বসিয়ে পূজা করা হলো। ভূত ছাড়াবার জন্যে ভূদেবকে প্রহার করা দরকার। কিন্তু এতটুকু ছেলেকে প্রহার করাও সম্ভব নয়। কাজেই পুজো শেষ হবার পর ভূতকে ছেলের কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য কারুর ঘাড়ে ভর করাতে হয়। ভূতের ভর আর কে নেবে! অগত্যা মাকেই নিতে হয়।

এদিকে, যখন পূজা হচ্ছে, হঠাৎ ভূদেবের মা অজ্ঞান হয়ে যান। ওঝা ভাবলো তাঁকে ভূতেই ভর করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ওঝার প্রশ্ন: বল্ তুই কে?

আশ্চর্য! ভূদেবের অচৈতন্য মায়ের মুখ থেকে উত্তর হলো: আমি হলধর যুগীর মা।

—কেন ছেলেকে ধরেছিস?

—বড় সুন্দর ছেলে বলে।

এ-ঘটনার পর থেকে সত্যিই ভূদেবের রোগবালাই সেরে গেল। নীরোগ-কামনায় ছোটবেলাতেই মাথায় জটা রাখতে হয়েছিল ভূদেবের। মা মানত করেছিলেন 'ক্ষেত্রপাল' নামের এক গ্রাম্য দেবতার কাছে। শিশু ভূদেব মাঝে-মাঝে মাথার সেই জটা নাড়িয়ে পাড়ার ছেলেদের দেখাতেন।

পিতা বিশ্বনাথ ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। স্পষ্টবক্তা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। মা ব্রহ্মময়ী দেবীও ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বিনী এবং ধর্মপরায়ণা। এমন পিতামাতার সন্তান ভূদেব। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুআরি কলকাতার ৩৭ নং হরিতকী বাগান লেনে ভূদেব জন্মগ্রহণ করেন।

ভূদেবের যখন তিন কি চার বছর বয়স, একদিন বাবার জুতোর মধ্যে নিজে পা দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে প্রণম্য ব্যক্তিদের জুতো পায়ে দেওয়া ছিল পাপের কাজ। ছেলের পায়ে বাবার জুতো দেখে বকলেন মা এবং বুঝিয়ে বললেন, গুরুজনের জুতো পায়েদেওয়া মানে গুরুজনকে অশ্রদ্ধা করা। এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে ছেলেকে

বাবার জুতো জোড়াটি মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকতে আদেশ দিলেন। শিশু ভূদেব তাই-ই করলেন। তখনকার দিনে, গুরুজন এতই সম্মান ও ভক্তির পাত্র ছিলেন যে তাঁদের দিকে পা রেখে বসলে বা শুলে কচি ছেলেরও পাপ হয়—এ ধারণা ছিল বদ্ধমূল। ফলে আশৈশব সংস্কার এবং শিক্ষার ফলে ছেলেরা বড় হয়েও গুরুজনদের প্রতি সম্মান দেখাতে কুণ্ঠিত হতো না।

পাঁচ বছর বয়সে ভূদেবের অক্ষর-পরিচয় হলো। ঠাকুরদা হরিনারায়ণ সার্বভৌমের কাছেই তাঁর হাতে-খড়ি হয়। বাড়িতে চলছিল বাংলা ও সংস্কৃত পড়া। চার বছর পরে অর্থাৎ ন'বছর বয়সে ভূদেব সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন। এখানে তিনি বছর দুই পড়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তাঁর ভাই দীনবন্ধু তখন ঐ কলেজের ছাত্র। তাঁরা পড়েন উপর শ্রেণীতে। সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে ভূদেব অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়া করতে লাগলেন। তাঁর শিক্ষকেরা—ভরতচন্দ্র শিরোমণি, রামজয় তর্কালঙ্কার, উমাকান্ত তর্কালঙ্কার—ছিলেন তাঁর পিতার একান্ত সুহৃদ্। ফলে এই সব শিক্ষকরা মাঝে-মধ্যে ভূদেবের বাড়িতেও যেতেন। মাঝে-মধ্যে বাড়িতে বসেও এঁরা ভূদেবের সংস্কৃত ব্যাকরণের পরীক্ষা নিতেন।

সংস্কৃত কলেজে উলাস্টন সাহেব ভূদেবকে ইংরেজি পড়াতেন। তিনিই ভূদেবকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবান করে তুললেন। ফলে ইংরেজির প্রতি যতটা মনোযোগ দিলেন বালক ভূদেব, সংস্কৃতের প্রতি দেখাতে লাগলেন ততোধিক অমনোযোগ। বাবা মনোক্ষুণ্ণ হলেন। কারণ সংস্কৃত অধ্যাপকের ছেলে সংস্কৃতেরই অধ্যাপক হবে, এটাই ছিল তাঁর ঐকান্তিক বাসনা। বাবার স্নেহভাজন বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব ইংরেজিতে কৃতবিদ্য হয়ে যখন তাঁকে অনুরোধ করতেন ছেলেকে ইংরেজি শেখাবার, তখনও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। সংস্কৃতের প্রতি অমনোযোগের জন্যে বাবার কাছে অনেক সময় প্রহারও হজম করতে হতো ভূদেবকে। সংস্কৃত বই ছেলের সামনে খুলে ধরে বাবা বলতেন—পড়্ আমার সামনে।

ছেলে চোখ বন্ধ করতো। সংস্কৃত পড়বেই না সে।

হাল ছেড়ে দিলেন বাবা। ভাবলেন, ঠিক আছে, সংস্কৃত ছেড়ে যখন ইংরেজির দিকেই ঝুঁকেছে ভূদেব, তখন ওকে আর বাধা দেব না। ছেলেকে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও। আজই তোমাকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দেব। সময় মতো রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমিতে' গিয়ে ভর্তি করে দিয়ে এলেন ছেলেকে। এক বছরের মধ্যে এ-স্কুল তাঁকে ত্যাগ করতে হলো। এই সময় সংস্কৃত কলেজের সেই উলাস্টন সাহেব ভূদেবকে পেয়ে খুশি হলেন। বললেন, এখন তো আর আমি তোমাকে ইংরেজি পড়াতে পারবো না, তবে এক মিশনারি মেম-সাহেবের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—নাম তার মিসেস্ উইলসন—তাঁর কাছে এখন থেকে তুমি ইংরেজি পড়বে।

আনন্দে ডগমগ ভূদেব। বেশ কিছুদিন মিসেস্ উইলসনের কাছে ইংরেজি শিখে ইংরেজিতে বেশ পাকা হয়ে উঠলেন তিনি।

তখনকার দিনে, কলকাতায় নতুন নতুন স্কুল তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এত ছাত্র কোথায়? অতএব স্কুল-কর্তৃপক্ষ অন্য স্কুলের ছাত্রদের ভাঙিয়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা করতেন। সবাই নতুন স্কুলে বিনা বেতনে পড়াবার প্রলোভন দেখাতেন। কিছুদিন গেলে স্কুলে যখন অনেক ছাত্র হতো তখন ছাত্রদের বেতন ধার্য হতো। যেমন, নতুন বাজার বসালে প্রথম প্রথম বিক্রেতাদের 'তোলা' দিতে হয় না—তেমনি আর কি! ভূদেবও এমনি এক নবীনমাধবের নতুন ফ্রী স্কুলে ভর্তি হলেন। ভূদেব মেধাবী, পড়াশোনায় মনোযোগী এবং পরিশ্রম করতে পারতেন খুব। ফলে এ-স্কুলে তাঁর ভালো ছাত্র হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়লো ছাত্র ও শিক্ষক মহলে। পরীক্ষার পর যখন ফল প্রকাশিত হলো তখন তাঁর শ্রেণীতে তিনি প্রথম হলেন এবং ফার্স্ট প্রাইজ পেলেন।

এই প্রাইজ পাওয়া নিয়ে সেদিন এক ঘটনা ঘটে। ভূদেবের বাড়িতে থাকতো তাঁর ছোট কাকার এক শ্যালক। নাম তার ছিরু।

সেও ভূদেবের সঙ্গে একই ক্লাশে পড়তো। স্কুলের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল, ছিরু কোনো রকমে পাশ করেছে।

কিন্তু একই বাড়ির ভূদেব প্রাইজ পেলেন আর ছিরু পেল না—এ ব্যাপারটি ছিরুর ভালো লাগলো না। বাড়িতে ফিরলে জামাইবাবু অর্থাৎ ভূদেবের ছোট কাকা তো তার কান দুটো ছিঁড়ে নেবেন। তাছাড়া এত লোকের সামনে সে মুখ দেখাবে কি করে? তাই ভূদেবের প্রতি ছিরুর কাতর প্রার্থনা: তুমি বাড়ির একমাত্র ছেলে, ভালো পাশ করেছো শুনলেই সবাই খুশি হবেন। ঐ প্রাইজের বই কটা আমাকে দাও। আমি বলবো, আমি প্রাইজ পেয়েছি।

বালক ভূদেব অনেক চিন্তা করলেন। ঠিক আছে, বড় জোর তাঁকে একটু তিরস্কারই করবেন প্রাইজ না-পাওয়াতে। ছিরুকে যদি প্রাইজের বইগুলো দিয়ে দি, তবে সত্যি হয়তো বাড়ির সবাই ওকে আদর করবে। বললেন, তাহলে মিথ্যে কথাই বলতে হবে বাড়িতে গিয়ে। ঠিক আছে, তোমার জন্যে তাও বলবো। তুমিই প্রাইজ পেয়েছো—একথা যেন ঠিক থাকে!

হঠাৎ ভূদেবের মনে হলো, কিন্তু বইতে যে কাগজের ওপর আমার নাম লেখা রয়েছে, তার কি হবে?

ও তুমি ভেবো না।—বলে, প্রাইজের বইয়ের ওপর থেকে ভূদেবের নাম-লেখা কাগজখানি ছিরু ছিঁড়ে তুলে ফেললো। দোকান থেকে নতুন কাগজ কিনে লেবেল তৈরি করে তার ওপর নিজের নাম লিখলো এবং আঠা দিয়ে বইয়ের ঠিক জায়গায় এঁটে দিল।

ব্যস্। বাড়িতে সবাই জানলো ছিরু এবার পাশ করে প্রাইজ পেয়েছে। কিন্তু ভূদেবের বাবার মনের কী অবস্থা তখন? যে-ছেলে বিন্দুমাত্র পড়াশোনা করেনা, সারাদিন দুষ্টুমী ও খেলাধুলো নিয়ে থাকে—সে কি না প্রাইজ পেল। আর তাঁর ছেলে ভূদেব?

বাবা-মা অসন্তুষ্ট জেনেও ভূদেব কিন্তু চুপ্। এ-যেন কোনো ব্যাপারই নয়—এমন একটা ভাব। বালক ভূদেব বাবা-মায়ের অনুযোগ নীরবে সহ্য করলেন। প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করলেন না।

এর মাস খানেকের মধ্যেই ভূদেব ধরা পড়ে গেলেন। ভূদেবের সেজো কাকার সঙ্গে একদিন দেখা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের। শিক্ষক মশাই তাঁর স্কুলের ছাত্রদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভূদেবের যথেষ্ট সুখ্যাতি করলেন। বললেন, আপনার ভাইপোটি হীরের টুকরো ছেলে। ওরকম সুন্দর স্বভাব ও লেখাপড়ায় অমন তেজ—আর কোনো ছেলের মধ্যে আমি দেখি না। এবার ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে।

সেজো কাকা বললেন, আপনি ছিরুর কথা বলছেন? ও আমার ভাইপো নয়, আমার ছোট ভাইয়ের শ্যালক। এবার ও ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে।

অবাক প্রধান শিক্ষক! —ছিরু ভালো ছেলে! —বিস্মিত হয়ে বললেন, ছিরু তো কোনো রকমে পাশ করেছে। ফার্স্ট হয়েছে তো আপনার ভাইপো ভূদেব। ও-ই তো প্রথম পুরস্কার পেয়েছে!

আপনি বোধহয় ভুল করছেন।—বললেন সেজো কাকা—প্রথম হয়ে প্রাইজ পেয়েছে ছিরু, ভূদেব নয়!

আমি নিজের হাতে লিখে প্রাইজ দিলাম, আর আপনি বলছেন, ছিরু প্রাইজ পেয়েছে? গিয়ে দেখবেন বাড়িতে প্রাইজের বইগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে।

সেজো কাকা বাড়িতে এসেই সব কথা বললেন দাদা-বৌদিকে। ডাকানো হলো ভূদেবকে। সব শুনে ভূদেব রইলেন অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে। আর বাবা বিশ্বনাথ? ছেলের এই মহানুভবতার কথা চিন্তা করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। পিতার স্নেহাশ্রুর সঙ্গে মিশে গেল গর্বিত পুত্রের আনন্দাশ্রু। মা-কাকা পাশে দাঁড়িয়ে মনে মনে আশীর্বাদ করলেন ভূদেবকে।

এর পর নবীনমাধবের স্কুল ছেড়ে এসে ভূদেব ভর্তি হলেন হিন্দু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের পঞ্চম শ্রেণীতে। সেটা ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের কথা। তখন তাঁর বয়স তেরো-চৌদ্দ। আগেই যেভাবে তিনি ইংরেজি শিক্ষা পেয়েছিলেন তাতে হিন্দু কলেজে এসেই ভালো-ইংরেজি-জানা ছাত্র হিসাবে তার সুনাম হলো।

এই সপ্তম শ্রেণীতেই তিনি তাঁর সহপাঠী হিসেবে পেলেন মধুসূদন দত্তকে। মধুসূদন তখনও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে 'মাইকেল' হননি। প্রথম পরিচয় হতে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেলেন মধুসূদন। একদিন স্কুলের ছুটির পর মধু বাইরে এসে ভূদেবকে হ্যাণ্ডসেক করে বললেন, ভাই, তোমার নাম কি, তোমার ঘর কোথায় ?

বললেন ভূদেব। এর পর থেকে বন্ধুত্ব ও মাঝে-মধ্যে মধুও ভূদেবের বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলেন। এ-সময়ে ভূদেবের সহপাঠিদের মধ্যে অনেকেই বিজাতীয় অনুকরণ করতে থাকে। এঁদের খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার সবই যেন অসংযত বলে মনে হতো ভূদেবের কাছে। এই সব সহপাঠীদের মধ্যে গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ভূদেব তো অন্য মানুষ। তাঁর পারিবারিক ব্যবস্থা অন্যরকম। বাড়িতে সন্ধ্যা-বন্দনাদি হতো, পুজো-আচ্চাও কম হতো না। হিন্দুধর্মের আচার-আচরণে অভ্যস্থ ভূদেব এমন সব সহপাঠীদের মধ্যেও নিজেকে গোড়া হিন্দু বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করতেন। তাছাড়া তাঁর বাড়ির আর্থিক অবস্থাও তাঁর অজানা ছিল না।

একবার একখানি ইংরেজি অভিধানের প্রয়োজন হয় ভূদেবের। ভূদেব তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু তাঁর হাতে তখন মোট দু'টাকা দশ আনা। এ টাকাটাও তাঁর অনেক দিন ধরে বিভিন্ন বাড়িতে ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা জমিয়ে জমিয়ে হয়েছে। সেই টাকাটা নিয়েই চলে গেলেন চীনাবাজারে মধুসূদন দে-র বইয়ের দোকানে। দেখলেন সেই দোকানে 'জনসনের ডিক্‌সনারি'টি আছে।

ভূদেব বইখানি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মধুসূদন দে-কে—এই ইংরেজি অভিধানটির দাম কত ?

মধু দে বললেন, চার টাকা।

ভূদেব বললেন, আমার কাছে দু' টাকা দশ আনা আছে, এতে বইটি দিতে পারেন না ?

না।—মধু দে-র সাফ জবাব—চার টাকায় বেচলেও লাভ বেশি

হয় না! আর তুমি বলছো দু' টাকা দশ আনা? এ-দামে দেওয়া যাবে না।

অগত্যা ভূদেব দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন অন্য দোকানে খোঁজ করতে। কিন্তু জনসনের অভিধান আর কোনো দোকানেই নেই। রোদে হাঁটতে হাঁটতে ভূদেবের মুখ লাল হয়ে গেছে। আর পারছেন না ঘোরাঘুরি করতে। আবার ঢুকলেন আগের দোকানে।

এবার মধু দে বললেন, রোদে ঘুরে এত কষ্ট পাচ্ছো কেন খোকা, আমি ঐ দামের মধ্যেই তোমাকে ছোট একখানি ইংরেজি অভিধান দিচ্ছি, নিয়ে যাও।

উঁহু—ভূদেব মাথা নাড়লেন। —ঐখানিই আমার দরকার। ছোট অভিধান হলে চলবে না। ঐখানা আমাকে দু' টাকা দশ আনাতে দিন।

মধু দে ভূদেবের নাছোড়-বান্দা ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন— তোমার পড়াশোনার এত আগ্রহ, তুমি কি কোনো ব্রাহ্মণের ছেলে? বালক ভূদেবের কাছ থেকে তাঁর পরিচয় জেনে নিলেন। তারপর বললেন, বেশ, তোমাকে পয়সা দিতে হবে না, অভিধানটি আমি অমনিই তোমাকে দিচ্ছি।

ভূদেব এতে রাজি নন। বললেন, না, তা হবে না। বিনা পয়সায় নিতে পারবো না। আমার যা আছে সেটা আপনাকে দিচ্ছি, আর যেটা দিতে পারলাম না, সেটুকুই মাত্র হবে আপনার দান।

ভূদেবের কথায় খুশি হলেন দোকানের মালিক মধুসূদন দে। তারপর ভূদেবের দেওয়া দু' টাকা দশ আনা রেখে বইখানি দিয়ে দিলেন তিনি। আর বললেন, তোমার যে-যে বই পড়ার দরকার হবে, আমার দোকান থেকে নিয়ে যেও। তুমি পড়ে আবার আমাকে ফেরত দিও।

এর পর থেকে ভূদেব মধু দের দোকান থেকে বহু বই বাড়িতে এনে পড়ার পর আবার ফেরত দিয়ে আসতেন। বই এমন যত্নে তিনি পড়তেন যাতে বইয়ের এতটুকু ক্ষতি না হয় বা দাগ না লাগে। ঠিক যেমনটি আনতেন, তেমনটি ফেরত দিতেন।

সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে ভূদেব হাতের লেখা একখানি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। নাম দিয়েছিলেন 'প্রাইভেট অবজারভার'। এ থেকে বোঝা গিয়েছিল, পরবর্তী জীবনে ভূদেবের সাহিত্যসৃষ্টি ও সাময়িকপত্র-সম্পাদনের প্রতি গভীর অনুরাগ। যেমন সাময়িকপত্র-সম্পাদক হিসাবে ভূদেবের নাম আজ ভারত-বিখ্যাত, তেমনি মননশীল সাহিত্যসৃষ্টিতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তিনি। ১২৭১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তিনি প্রকাশ করেন 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার' নামে মাসিক পত্রিকা। ১২৭৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা থেকে বর্ধমানের 'মাসিক পত্রিকা' এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাম হয় 'শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকা'। এ পত্রিকাটি ১২৭৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। ইতিমধ্যেই তিনি 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন (১৮৬৮ খ্রী.)। এছাড়া তাঁর লেখা বইও বাংলা সাহিত্যকে কম সমৃদ্ধ করেনি। তাঁর লেখা 'পুরাবৃত্তসার' (১৮৫৮), 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' (১৮৬২), 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৫) ইত্যাদি বই খুবই উল্লেখযোগ্য।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান ভূদেব, বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও স্বদেশীয় শাস্ত্রে আস্থা হারাননি কোনো দিন। আদর্শ শিক্ষক-রূপে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন, সরকারী শিক্ষা-বিভাগে চাকরি নিয়ে 'ইন্‌স্‌পেক্টর অব স্কুল' হয়েছেন, সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেছেন, বইপত্র লিখেছেন—এত কাজের মধ্যেও তিনি সংসারযাত্রাও নির্বাহ করেছেন নিপুণভাবে। নিজের যোগ্যতাবলে ও কঠোর পরিশ্রমে যে সাধারণ অবস্থা থেকে একজন মানুষ উন্নতির চরম শিখরে উঠতে পারেন —ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

আগেই ভূদেবের শিক্ষাজীবনের কথা বলেছি। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পঞ্চম শ্রেণী থেকে পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। জুনিয়র-বৃত্তিও পেলেন মাসিক আট টাকা। বন্ধু মধুসূদন দত্ত এবং শ্যামাচরণ লাহাও পরের বছর বৃত্তি পেয়েছিলেন। ১৮৪২-এ সিনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে বর্ধমান-রাজ-বৃত্তি পেলেন ভূদেব। এবার

বৃত্তির টাকার পরিমাণ ছিল চল্লিশ। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে উঠলেন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। ভূদেব প্রথম শ্রেণীতে পড়েছিলেন দু'বছর। তারপর তিনি কলেজ ত্যাগ করে (১৮৪৫) চাকরির চেষ্টায় ঘুরতে লাগলেন।

কুড়ি বছর বয়সে সংসারের সচ্ছল অবস্থা আনতে ভূদেব প্রথমেই চাকরি করতে শুরু করেন 'হিন্দু চ্যারিটেব্‌ল ইন্‌স্টিটিউশান'-এ। বেতন ষাট টাকা। এর পর থেকে নানাস্থানে কখনো শিক্ষকতা, কখনো স্কুল-পরিদর্শক হিসাবে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে চাকরি করেন। পাটনা, ভাগলপুর, বর্ধমান, কলকাতা, চন্দননগর, উড়িষ্যা—সর্বত্রই তাঁর কাজের সঙ্গে মেশানো ছিল কৃতিত্বের প্রশংসা। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম : ১৮৩৮ : মৃত্যু : ১৮৯৪

সময়টা সিপাই-বিদ্রোহের। আঠারো শ' সাতান্ন সাল। বালক নন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন উনিশ বছরের যুবক। সমগ্র ভারতবর্ষ তখন অশান্ত। ব্যারাকপুর, বহরমপুরে আগুন জ্বলছে, দিল্লী-কানপুর-মাদ্রাজ-অযোধ্যায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও হুগলি কলেজের ছাত্র।

চুঁচুড়ায় সামরিক আইন জারি হয়েছে। ব্রিটিশ গোরা-সৈন্য-বাহিনী সেখানে তাঁবু ফেলেছে। সেনানিবাসের নিচেই গঙ্গার ঘাট। নাম তার ব্যারাকের ঘাট। গ্রামের নিরীহ লোকজনের উপরও মাঝে মধ্যে গোরা-সৈন্যদের অত্যাচার চলে। ফলে গ্রামের সবাই সৈন্যদের ভয়ে থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত।

এমনি সময়ে, সন্ধ্যার পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রকে নিয়ে চলেছেন চুঁচুড়ায়, থিয়েটার দেখতে। ভাইকে সঙ্গে নিয়ে পৃথক্ নৌকো থেকে নামলেন বঙ্কিম ঐ ব্যারাকের ঘাটে। নেমে শুনলেন, এখান থেকে থিয়েটারের জায়গাটা দূরে, 'ঘণ্টা'-ঘাটে নামলেই কাছে হবে। বঙ্কিম বললেন, এখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে যাবো গঙ্গার ধার ধরে। বেশ ভালো লাগছে বেড়াতে। রাস্তার ধারে, গঙ্গার দিকে বাঁশের রেলিং, মাঝে-মধ্যে থাম। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, জন কয়েক গোরা-সৈন্য রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর বসে গল্প করছে। তাদের সঙ্গে দু'-একটি কুকুরও আছে। বঙ্কিম আগে,

পিছনে পূর্ণচন্দ্র। হঠাৎ দুটো কুকুরই পূর্ণচন্দ্রের পিছনে লাগলো। ভয় পেয়ে পূর্ণচন্দ্র একটি থামের ওপর উঠে পড়েছেন। পূর্ণচন্দ্র যত ভীত হচ্ছেন কুকুর দুটো ততই ঘেউ-ঘেউ করতে করতে থামের ওপর লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। গোরা-সৈন্যরাও বেশ মজা পেয়ে কুকুর দুটোকে উৎসাহিত করতে লাগলো নানারকম শব্দ ও চিৎকার করে।

বঙ্কিম প্রথমে এসব খেয়াল করেননি। হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে ছোট ভাইদের এ-অবস্থা দেখে বঙ্কিম রাগে ফেটে পড়লেন। সাহেবদের লক্ষ্য করে সক্রোধে ইংরেজিতে বললেন—সুন্দর খেলা পেয়েছো তোমরা। তোমাদের লজ্জা করে না এমনি সব বাঁদরামিতে? একজন বাঙালী যুবকের মুখ থেকে এমন কথা শোনার প্রত্যাশা গোরাসৈন্যদের ছিল না। তাই তারা লজ্জিত হয়ে কুকুর দু'টোকে ডেকে নিল।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, সত্যপথে চলতে ছেলেবেলা থেকেই শিখেছিলেন বঙ্কিম। মাতা দুর্গাসুন্দরী দেবী ও পিতা যাদবচন্দ্রের চরিত্রের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর ছিল অত্যন্ত বেশি। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সে বঙ্কিমের 'হাতেখড়ি' হয়। তারপর গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি হয়ে অ-আ, ক-খ পড়তে শিখলেন। তখনকার দিনে ছোটদের পাঠ্যপুস্তক ছিল 'শিশুবোধক'। এই 'শিশুবোধক' তিনি কয়েকদিনের মধ্যে মুখস্থ করে ফেলেন। গুরুমশাই রামপ্রাণ সরকার তো একদিন বলেই ফেললেন, বাবা বঙ্কিম, এভাবে পড়ে বই শেষ করে ফেললে আর কতদিন তোমাকে পড়াতে পারবো?

না। রামপ্রাণ সরকারকে আর বেশিদিন বঙ্কিমকে পড়াতে হয়নি। এর আট-নয় মাস পরেই যাদবচন্দ্র ছেলেকে নিয়ে গেলেন মেদিনীপুরে, নিজের কাছে। যাদবচন্দ্র তখন সেখানকার ডেপুটি কালেক্টর। সালটা ১৮৪৪। মেদিনীপুরে এসে বঙ্কিম ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজি বর্ণমালাও শিখে ফেললেন তিনি। স্কুলে থাকতে একদিন বঙ্কিম দেখলেন, স্কুলের সামনে দিয়ে একটি লোক ডুগডুগি বাজাতে-বাজাতে বানর নিয়ে খেলা দেখাতে যাচ্ছে।

তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্কুল ছেড়ে ছুটলেন বানরের পিছু-পিছু। বেশ কিছুক্ষণ পরে স্কুলে ফিরে এলে পণ্ডিতমশাই খুব বকলেন। বললেন, তোমার অমনোযোগের জন্যে আজকের পড়া তোমার কিছুই হলো না। বালক বঙ্কিম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, আমাকে মাত্র একটি ঘণ্টা সময় দিন, সব পড়া মুখস্থ করে আপনাকে বলবো।

অবাক হলেন গুরুমশাই। বললেন, তাই দিলাম। দেখি তোর ক্ষমতাটা।

বঙ্কিম এক সপ্তাহের পাঠ এক ঘণ্টায় আয়ত্ত করে গুরুমশাইয়ের সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে দিলেন। কেবলমাত্র গুরুমশাই নন, সব ছাত্রই অবাক্-বিস্ময়ে বঙ্কিমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

এই-ই তো বালক-বঙ্কিম—যার লেখনীর প্রভায় বাংলা সাহিত্য জগৎ একদিন আলোকিত হয়ে উঠেছিল উজ্জ্বল হয়ে।

বাল্যকাল থেকেই বঙ্কিম বালকসুলভ কোনো খেলার অনুরাগী ছিলেন না। কিন্তু তাস খেলতে খুবই ভালোবাসতেন। স্কুলের ছুটির পর সমবয়স্ক বালকদের নিয়ে তাস খেলতে বসতেন। এ-অভ্যাস হুগলি কলেজে পড়ার সময়েও ছিল।

বঙ্কিমের ছেলেবেলা প্রসঙ্গে তাঁর ছোট ভাই লিখেছেন :

"সেকালের পল্লীগ্রামমাত্রেই পাঠশালা থাকিত। আমাদের গ্রামেও পাঠশালা ছিল, আমাদের বাটির সন্নিকটে একটি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত নহে। হুগলি কলেজে ভর্তি হইবার পূর্বে তাহাকে একজন Private tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বালক, উপনয়ন হয় নাই। এই অবস্থায় তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ পাঠশালায় উপস্থিত হইতেন। গুরুমহাশয় কায়স্থ সন্তান, বড় রাসভারি লোক, ছাত্ররা তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। যখন তিনি ভূমিতে বেত আছড়াইয়া, 'লেখ্, লেখ্, শুয়াররা' বলিয়া চীৎকার করিতেন, তখন ছাত্রেরা থরহরি কাঁপিতে থাকিত। বালক বঙ্কিম, এক একদিন বৈকালে

এই পাঠশালায় উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনাস্বরূপ গুরুমহাশয় হাসিয়া তাঁহার হস্তে বেতগাছটি তুলিয়া দিতেন। বালক বঙ্কিম বেত লইয়া কোন কোন ছাত্রের নিকট গিয়া তাহার পরীক্ষা করিতেন। ছাত্রেরা কেহ বা তাহার বয়োজ্যেষ্ঠ, কেহ সমবয়স্ক, কেহ বা বয়োকনিষ্ঠ। অধিকাংশ ছাত্র তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে দুই তিনজন বালকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর বেত দুলাইয়া বলিতেন, 'মারি' 'মারি', আজ তোমরা কেন আমাদের বাড়ি তাস খেলিতে যাও নাই?' বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে খেলার মধ্যে কেবল তাস খেলিতেন, দুই প্রহরের সময়ে ঐ কয়জন বালকের সহিত কোন কোন দিন তাস খেলিতেন। বালকদিগের দৌড়াদৌড়ি এবং অন্যান্য খেলা—যাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন করে—তাহা খেলিতেন না। খেলিতে ভাল লাগিত না, সেইজন্য দুর্বল ও ক্ষীণদেহ ছিলেন···। এইরূপে মধ্যে মধ্যে বালকদিগের পরীক্ষা করাতে তাহাদের উৎসাহ হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাল্যকালে দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতে ছিল, উহার প্রভাবে অন্যান্য বালকেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত, সকলে তাঁহার নিকট ঘেঁসিতে পারিত না। তিনি কাহাকেও ভাল বলিলে, তাহার আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধিত হইত। স্কুলে, কলেজে, তাঁহার সমাধ্যায়ীদিগের উপর ঐরূপ প্রভাব ছিল, ইহা তাঁহার অসামান্য প্রতিভারই মহিমা। লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদান করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

পৌষ কি মাঘ মাসে একদিন সূর্যোদয়ে পাঠশালায় যাইয়া গুরু-মহাশয়-দত্ত বেত লইয়া, বালক বঙ্কিম, কোন একটি বালকের নিকট বসিয়া তাহার লেখাপড়া দেখিতেছিলেন, এমত সময় একটা গোল উঠিল যে, গঙ্গার ঘাটে গোরার বহর লাগিয়াছে। এই সংবাদে চারিদিকের লোকজন, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি বালক, ছুটাছুটি করিয়া পলাইতে লাগিল। পাঠশালার ছাত্রগণ পাত্তাড়ি ফেলিয়া পলাইল। গুরুমহাশয় চটি জুতা-পায়ে ফট্‌ফট্ শব্দে পলাইলেন। এক ব্যক্তি এক বাজরা বেগুন লইয়া নৈহাটির বাজারে বিক্রয় করিতে

যাইতেছিল, সে উহা আমাদের ঠাকুরবাড়ির দরজার নিকটে ফেলিয়া পলাইল। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তাঘাট নির্জন হইল। সকল বাটির দরজা বন্ধ হইল, কেবল বালক বঙ্কিমের জন্য আমাদের বাড়ির দরজা খোলা রহিল। তিনি গুরুমহাশয়-প্রদত্ত বেত হাতে করিয়া আমাদের বাটির দরজার নিকট রাস্তার ধারে দাঁড়াইলেন, সুতরাং আমাদের যত লোকজন ছিল, তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। পিতৃদেব তখন তাঁহার কর্মস্থলে, অগ্রজদ্বয়ও তাঁহার নিকটে। গ্রামে গোরার বহর লাগিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা বিপদ ভাবিয়া পলায় কেন! সেকালে পশ্চিমাঞ্চল হইতে গোরারা কুচ্ করিয়া কলিকাতায় আসিত, কিন্তু পীড়িত গোরারা যোকাযোগে আসিত। যে স্থানে সূর্যোদয় হইত, সে সকল স্থানে ঐ সকল গোরা প্রাতঃক্রিয়ার জন্য ডাঙ্গায় উঠিত, এবং গ্রামে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকারে উৎপাত করিত। দুই-তিন বৎসর পূর্বে একবার গোরারা আমাদের গ্রামে নামিয়া ঐরূপ অত্যাচার করিয়াছিল। সেই অবধি গোরার বহর শুনিলে আমাদের গ্রামের লোকের হৃৎকম্প হইত। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুমহাশয়-দত্ত বেত্রহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন, এমত সময়ে একদল গোরা আসিতেছে দেখা গেল। তাহারা আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতে লাগিল, একজন বেতটি লইয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে দলে দলে গোরা আসিতে লাগিল। বালক বঙ্কিম স্থিরভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা ফিরিয়া গেল, বহর ছাড়িয়া দিল, গ্রাম আবার সজীব হইল।

কথাটা অতি সামান্য বটে, কিন্তু যে গ্রামের লোকেরা গোরার ভয়ে পলাইল, সকল দরজা বন্ধ হইল, বালক বঙ্কিম সেই গ্রামেই প্রতি-পালিত, আকাশ হইতে পড়েন নাই। তিনি নির্ভয়ে বেত্রহস্তে গোরার সম্মুখে দাঁড়ান কেন, এই তেজটুকু বালকের অসামান্য বোধ হওয়াতেই এই স্থলে এই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। তিনি নিজেই চন্দ্রশেখরের এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যে 'বাঙ্গালীর ছেলে মাত্রেই জুজুর নামে ভয় পায়, কিন্তু এক একটি এমন বালক আছে যে জুজু দেখতে চায়।'

মেদিনীপুর থেকে এসে বঙ্কিমচন্দ্র ভর্তি হলেন হুগলি কলেজের স্কুল বিভাগে। তখন কলেজটি কলেজ ও স্কুলে বিভক্ত ছিল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তিনি যখন এখানে ভর্তি হলেন তখন তাঁর বয়স সাড়ে এগারো বছর। বাৎসরিক পরীক্ষায় ফল এত ভালো হলো যে তিনি পুরস্কার পেলেন। তখনও প্রবেশিকা (এনট্রান্স) ও বি· এ· পরীক্ষার প্রবর্তন হয়নি। ছাত্রদের জুনিয়ার ও সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দিতে হতো। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়ে মোট তিয়াত্তর জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেলেন। মোট সাতটি বিষয়ের মধ্যে ছ'টি বিষয়েই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করলেন এবং স্কলারশিপ পেলেন। এই সময়েই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'-এ কবিতা লিখতে শুরু করেন।

জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় পাশ করে মাসিক আট টাকা বৃত্তি পেলেন এবং কলেজ-বিভাগের চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হলেন। এই চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের যে বাৎসরিক পরীক্ষা হতো তার নাম ছিল 'সিনিয়ার স্কলারশিপ একজামিনেশন'। এই পরীক্ষায়ও বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। এবং দ্বিতীয় বছরের জন্যেও মাসিক আট করে বৃত্তি পেলেন। সে বছর পরীক্ষার্থী ছিল তের জন। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ কৃতিত্বের জন্য দু'বছর যাবত আরো কুড়ি টাকা করে মাসিক বৃত্তি পেলেন। এর পর উঠলেন থার্ড ইয়ারে। এখানে কয়েক মাস পড়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়তে আসেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন-বিভাগ থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন ১৮৫৭-র এপ্রিল মাসে। উত্তীর্ণ হলেন প্রথম বিভাগে। সে-বছর প্রথম বিভাগে যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ

ঠাকুর ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। বঙ্কিম ছাড়া এঁরা সবাই বিভিন্ন স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

আইন পড়তে পড়তে বঙ্কিমচন্দ্র বি.এ. পরীক্ষা দেবার সংকল্প করেন। ১৮৫৮-র এপ্রিলে বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বি. এ. প্রবর্তনের প্রথম বছর মোট দশ জন ছাত্র বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছিল। পাশ করলেন মাত্র দু'জন। দু'জনেই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু। ১৮৫৮-র এপ্রিল মাসে বি.এ. পরীক্ষা দেবার পর তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্সিতে আইন পড়তে লাগলেন। কিন্তু বেশিদিন আর পড়াশোনা করতে পারেননি। যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ পেয়ে তিনি যশোহরে চলে যান। চাকরি করতে করতে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি বি. এল. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করলেন।

এর পর শুরু হলো তাঁর কর্মজীবন। ছাত্রাবস্থায় তাঁর অনন্য-সাধারণ বুদ্ধি ও মেধাশক্তি তাঁর শিক্ষকদের করেছিল বিস্মিত। পরবর্তীকালে লেখকহিসাবে, দেশহিতৈষী হিসাবে পত্রিকাসম্পাদক হিসাবে বাংলার আপামর জনসাধারণ বঙ্কিমচন্দ্রকে সমাদরে গ্রহণ করেছিল। 'বন্দেমারম্' মন্ত্রের শ্রষ্ঠা বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাধারাণী' (১৮৭৫), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'রাজসিংহ' (১৮৮২), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে এবং 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ: ১৮৭২ খ্রী এপ্রিল/১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ) সম্পাদকরূপে বাংলা সাহিত্যে নতুন জীবন দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়: '...বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে সে-কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। ...এমন সময়ে

তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিতা বঙ্গ-ভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন।'

আজ আমাদের বাংলা ভাষার জন্য যে গর্ব তার মূলে তো বঙ্কিমচন্দ্রের দান অপরিসীম। একথা যেন আমরা কখনও ভুলে না যাই, বঙ্কিমসাহিত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপরই রচিত হয়েছে আজকের আধুনিক সাহিত্য।

৮ এপ্রিল ১৮৯৪ (২৬ চৈত্র ১৩০০) খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী

জন্ম: ১৮৪৭ ॥ মৃত্যু: ১৯১৯

বাল্যকালে শিবনাথ শাস্ত্রীর পাখি-ধরা ও পাখি-পোষার খুব সখ ছিল। 'পাখির বাসা হইতে বাচ্চা চুরি করিয়া আনিতাম, আনিয়া তার মায়ের মত যত্নে তাহাকে পালন করিতাম।' শিবনাথ শাস্ত্রী আরও লিখেছেন: 'সে জাতীয় পাখিরা কি খায়, তাদের মায়েরা কিরূপে খাওয়ায়, এ সকল সংবাদ পাড়ার ডাংপিঠে ছেলেদের কাছে পাইতাম; সেইরূপ করিয়া দিনের মধ্যে দশ বার করিয়া খাওয়াইতাম। হাঁড়ির গায়ে ছিদ্র করিয়া তার মধ্যে কুটিকাটি দিয়া বাসা বাঁধিয়া তার মধ্যে বাচ্চা রাখিতাম। রাখিয়া একখানি সরা দিয়া ঢাকিয়া হাঁড়িটি ঘরের চালে ঝুলাইয়া রাখিতাম, পাছে সাপে খাইয়া যায়। তারপর খেজুর গাছের ডাল কাটিয়া, অগ্রভাগের পাতাগুলি চিরিয়া, খ্যাংরার মত করিতাম, তাহাকে বলে ছাট। সেই ছাট হাতে করিয়া মাঠে মাঠে ঘাস-বনে ফড়িং ধরিতে যাইতাম। ঘাসের উপর ছাটগাছি বুলাইলেই ফড়িং লাফাইয়া উঠিত। অমনি সেই ছাট সজোরে তার পৃষ্ঠদেশে মারিয়া তাহাকে অর্ধমৃতপ্রায় করিতাম। সেই অচৈতন্য অবস্থাতেই তাহাকে এক বাঁশের কেঁড়ের মধ্যে পুরিতাম। এইরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফড়িং ধরিতাম। ধরিয়া আনিয়া পাখিকে খাওয়াইতাম। পাখির বাচ্চা-পোষা প্রায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হইত। বাবা তখন ছুটিতে বাড়িতে থাকিতেন। তিনি আমার পাখিপোষা দেখিতে পারিতেন না। পড়াশোনার ব্যাঘাত হয়, ইহা সহিতে পারিতেন না।

পাখির বাচ্চাকে খাওয়াইতে দেখিলেই আমাকে মারিতেন। সুতরাং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে আমাকে ঐ বাচ্চার মায়ের কাজ করিতে হইত। পিতার হস্তে এত প্রহার খাইয়াও কিরূপে আমি তাহাকে পালন করিতাম, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয়।

মা আমার পাখি পোষার বড় বিরোধী ছিলো না। বোধহয় ছেলে বাড়িতে থাকে এবং একটা কাজে ভুলিয়া থাকে, এই তাঁর মনের ভাব ছিল। কিন্তু তাঁহারও পাখি-পোষা সখ ছিল।'

১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১ জানুআরি (১২৫৩ বঙ্গাব্দের ১৯ মাঘ) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চাংড়িপোতা গ্রামে মামার বাড়িতে শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরানন্দ ভট্টাচার্য এবং মাতা গোলকমণি দেবী। পাঁচ বছর বয়সে শিবনাথ গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। তারপর মজিলপুরে হার্ডিঞ্জ মডেল (বাংলা) স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করেন। স্কুল বুক সোসাইটির 'বর্ণমালা' ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' তখন স্কুলে পাঠ্য ছিল। বাড়িতে শিবনাথ তাঁর মায়ের কাছে পড়াশোনা করতেন। শিবনাথের নিজের কথায়ঃ 'ফলতঃ পণ্ডিত মহাশয় আমাকে বড় ভালবাসিতেন; তাহার কারণ এই, আমি ক্লাসে পড়াতে সর্বদা প্রথম কি দ্বিতীয় স্থানে থাকিতাম। তাহার কারণ ছিলেন আমার মা। আমি মায়ের কাছে পড়া শিখিয়া যাইতাম। তবে আমার এইটুকু প্রশংসার বিষয়ে যে, পড়াতে আমার মনোযোগ ছিল। মা প্রাতে উঠিয়া গৃহকর্মে ব্যস্ত হইতেন। আমি বইখানা হাতে লইয়া, 'মা, এটা কি?' 'মা, একথার অর্থ কি?' এই বলিতে বলিতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি! শিশুশিক্ষাতে আছে, আ ও ঢ-য়ে য-ফলা,—উদাহরণ 'আঢ্য লোক সদা সুখী'। মা ফিরিয়া বলিলেন, 'ওটা আঢ্য'। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইতাম না। প্রশ্ন, আঢ্য কাকে বলে মা? উত্তর, 'আঢ্য বলতে বড় মানুষ, যেমন গোপালবাবু' (গ্রামের একজন জমিদার)। স্কুলে পণ্ডিত মহাশয় যেই 'আঢ্য' শব্দ বানান করিতে বলিলেন অমনি সর্বাগ্রে আমি বানান করিলাম, 'আ ও ঢ-য়ে য-ফলা—আঢ্য, আঢ্য বলতে বড় মানুষ,

যেমন গোপালবাবু।' পণ্ডিত মহাশয় শুনিয়াই হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'হাঃ—হাঃ—ও তুই কোথায় পেলি রে?' উত্তর, 'কেন, আমার মা বলে দিয়েছে।'এইরূপে মায়ের গুণে কোনও বালক আমাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ইহার এক ফল এই হইল যে অন্যান্য বালকেরা বাড়িতে গিয়া নিজ নিজ মায়ের কাছে আবদার আরম্ভ করিল, শিবের মা কেমন পড়া বলে দেয়, তুমি কেন দাও না? মায়েরা বলিতে লাগিলেন, 'আরে ম'লো, আমি কি লেখাপড়া জানি? শিবের মা ত ভাল জ্বালা ঘটালে।' এইরূপে আমার মা একটু লেখাপড়া জানিয়া ঘরে ঘরে গোল বাধাইয়া দিয়াছিলেন।'

শিবনাথ শাস্ত্রীর বড় হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর মায়ের প্রভাব এত বেশি ছিল, যা তিনি আমৃত্যু স্বীকার করে গেছেন। মায়ের তেজস্বিতা, মায়ের আদর-সোহাগ, মায়ের আত্মমর্যাদাবোধ, মায়ের সত্যবাদিতা শিবনাথকে আদর্শ পুরুষরূপে গড়তে সাহায্য করেছিল। বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি ছাত্ররূপে। মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু। ফলে তাঁর সঙ্গে যোগযোগের মাত্রাটাও ছিল নিবিড়। কিন্তু পিতা হরানন্দ ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী ও একগুঁয়ে। নিজে যা ভাল বলে মনে করতেন, শত অসুবিধা সত্বেও তিনি তা করতেন। ফলে সংসারে অশান্তি প্রায়ই লেগে থাকতো।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবার সঙ্গে শিবনাথ কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন। বাবার একান্ত ইচ্ছে ছিল হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করিয়ে পুত্রকে ইংরেজি শেখাবেন। কারণ সংস্কৃত পড়ে ভালো চাকরি পাওয়া ছিল অত্যন্ত দুষ্কর। কিন্তু তা হলো না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথও তখন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক। তিনি বললেন, ভাগ্নে সংস্কৃত কলেজেই পড়ুক। শিবনাথ তাই মাতুল দ্বারকানাথের কথা উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর পিতাকেও অগত্যা হেয়ারের স্কুলে পড়ানোর সংকল্প ত্যাগ করতে হলো। কলকাতার চাঁপাতলায় মামার

বাসাতেই তিনি বাস করতে লাগলেন। সংস্কৃত কলেজেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রথম শিবনাথের প্রথম পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে এই পরিচয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের মিল না হওয়াতে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করেন। ওঁর জায়গায় এলেন ই. বি. কাউয়েল সাহেব। 'তিনি সাধুতার মূর্তি ছিলেন। ছাত্রদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। ছাত্রদের সত্যবাদিতার তিনি প্রশংসা করতেন। একদিন এই কলেজেই শিবনাথের ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে একটা ছোট কাঠের সিঁড়ি নিয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের মারপিঠ হয়। ছুটির পর এর তদন্ত করতে এলেন স্বয়ং কাউয়েল সাহেব। প্রথমেই গম্ভীরমুখে বললেন, যে-যে মারপিঠের মধ্যে ছিলে উঠে দাঁড়াও। কেউ দাঁড়ায় না দেখে শিবনাথ উঠে দাঁড়ালেন। একা শিবনাথকে দাঁড়াতে দেখে অধ্যক্ষ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি একাই মারপিঠের মধ্যে ছিলে? মাথা নাড়লেন শিবনাথ, না, স্যার, ক্লাসের সবাই ছিল। ইহার পর সাহেব ক্লাসশুদ্ধ বালকের দুই টাকা করিয়া জরিমানা করিলেন, এবং আমাকে তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া বড় বাড়িতে তাঁর ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'তুমি সত্য বলিয়াছ বলিয়া মার্জনা করিলাম। কিন্তু দাঙ্গাতে গিয়া ভাল কর নাই।' আরও অনেক সদুপদেশ দিলেন। তিনি যখন আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, 'তুমি ভাল ছেলে, আমি তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছি', তখন ভাল ছেলে হইবার বাসনা যে মনে কত প্রবল হইল, তাহা বলিতে পারি না।' কেবলমাত্র একটি ঘটনাই নয়, এমন বহুবার শিবনাথ তাঁর জীবনে সত্যবাদিতার জন্যে বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন।

খুব ছোটবেলা থেকেই শিবনাথ কবিতা রচনা করতে পারতেন। বর্ণপরিচয় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মা তাঁকে রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়ে শোনাতেন। তাছাড়া কলকাতায় এসে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাও মন দিয়ে পড়তেন। ফলে ছন্দের কান তাঁর ছোটবেলা থেকেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শিবনাথের বাবাও ছিলেন কবিতার রসগ্রাহী

মানুষ। এসব কারণেই বোধকরি শিবনাথের কাব্যরচনার প্রয়াস বাল্যকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময়ে তাঁর সহপাঠী গঙ্গাধর নামে একটি স্থূলকায় ধনীর সন্তানকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছিলেন :

ইজার চাপকান গায় ইস্কুলে আসে যায়
নাম তার গঙ্গাধর হাতী,
বড় তার অহঙ্কার ধরা দেখে সরাকার
চলে যেন নবাবের নাতি।

ভবানীপুরের বাসায় থাকতে শিবনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাছাড়া তাঁর নিজের গ্রাম মজিলপুরেও ব্রাহ্মদিগের উদ্যোগে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ফলে গ্রামের উপর ব্রাহ্মদের প্রভাব বেড়ে গেল। কিন্তু বিবাদ বাধলো গ্রামের জমিদারের সঙ্গে। তিনি বাড়ি বাড়ি লোক পাঠিয়ে বলে পাঠালেন, যারা এই স্কুলে মেয়ে পাঠাবে তাদের একঘরে করে রাখা হবে। ভয় পেয়ে অনেক অভিভাবক তাঁদের মেয়েকে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করলেন। কিন্তু শিবনাথের পিতা তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের প্রিয় লোক, তেজী মানুষ। সত্য ও ন্যায় নিয়ে তিনি জীবন কাটাবেন। যদি কারো মেয়ে স্কুলে না যায়, আমার মেয়ে যাবে ; দেখি কে কি করে!' হরানন্দ এই বলে মেয়েদের নিয়ে স্কুলে গেলেন এবং পণ্ডিতকে বললেন, 'কেবল আমার মেয়ে আসবে আর তুমি আসবে। স্কুল একদিনের জন্যও বন্ধ ক'রো না।'

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ সেকেণ্ড গ্রেড স্কলারশিপ পেয়ে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করলেন। এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এল. এ. পাশ করে ডাফ-বৃত্তি পেলেন। এই বছরের ২২ আগষ্ট কেশবচন্দ্র সেনের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন। তারপর সিন্দুরিয়াপট্টি ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম আচার্যের পদে আসীন হলেন। তখন তিনি বাইশ বছরের যুবক। এর মধ্যে তিনি একখানি খণ্ডকাব্য লিখে প্রকাশ

করেছেন—'নির্বাসিতের আত্মবিলাপ' (প্রকাশ ১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮)। পরে তিনি প্রায় একত্রিশখানি পুস্তক রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'পুষ্পমালা' (কাব্যগ্রন্থ, ১৮৭৫), 'মেজ বউ' (উপন্যাস, ১৮৮০), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাল্যকালে কোনো কিছু দেখলেই শিবনাথ তার প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে পড়তেন। একবার পাঠশালায় যাবার পথে গাছে একটি নতুন রকমের পাখি দেখতে পেলেন। আগে এমন পাখি তিনি কখনো দেখেননি। লেজ তুলে পাখিটি চমৎকার শিস্ দিচ্ছে। নিবিষ্ট মনে পাখিটির দিকে তাকিয়ে আছেন শিবনাথ। অন্যদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এমন সময়ে পোলবন্দী-সাহেবের হাতি আসছে ঐ রাস্তা দিয়ে। মাহুত চেঁচাচ্ছে—'ওরে ও ছেলে—পালা, পালা, তুই ম'লি কিন্তু'—কে কার কথা শোনে। তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গাছে-বসা পাখি দেখছেন। হঠাৎ মাহুতের চিৎকার কানে যেতেই তাকিয়ে দেখেন, হাতি তার শুঁড় দিয়ে তাঁকে ধরতে আসছে। ভয়ে এক লাফে সেখান থেকে সরে গেলেন শিবনাথ। এই আত্মভোলা তন্ময় বালক যখন শিশু, কেবল কথা বলতে শুরু করেছেন, তখন থেকেই সকল বিষয়েই 'কেন কেন' বলে তাঁর মাকে অস্থির করে তুলতেন। হয়তো কোনো দিন মায়ের কোলে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন, পথে দেখতে পেলেন একটা গোরু। অমনি প্রশ্ন ছেলের —'ও কাদের গোরু?' মা উত্তরে বললেন,—'পুঁটেদের গোরু।' প্রশ্ন—'এখানে রেখে গেছে কেন?' উত্তর—'ঘাস খাবে ব'লে।' আবার প্রশ্ন—'কেন ঘাস খাবে?' মায়ের উত্তর—'খিদে পেয়েছে ব'লে।' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন—'কেন খিদে পেয়েছে?' উত্তর—'সমস্ত রাত কিছু খায়নি বলে।' 'কেন খায়নি?' 'ওরা গোরুকে রাত্রে জাব্না দেয় না ব'লে।' 'কেন জাব্না দেয় না?' 'ওরা গরিব বলে।' 'গরিব কাকে বলে?' সময়ে সময়ে এই 'কেন'র মাত্রা এত বেশি হতো যে মায়ের উত্তরের বদলে পিঠে কয়েকটা চড় খেয়ে 'কেন' প্রশ্ন বন্ধ করতে হতো শিবনাথের। এত 'কেন'-র উত্তর কে

দেবে তাঁকে? পরবর্তী সারাটি জীবন ধরে তো তিনি এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজেছেন। কিছু পেয়েছেন, পাননি যা যাও তো অনেক।

সেই যে স্কুল ইনস্‌পেক্টর উড্রো সাহেবের ঘরে যেদিন চটি জুতো প'রে ঢুকেছিলেন শিবনাথ সেদিনও তো তিনি 'কেন'-র উত্তর খুঁজেছিলেন। শিবনাথ তখন সংস্কৃত কলেজে পড়েন। বাবা হরানন্দ একদিন একখানি সরকারী কাগজ শিবনাথের হাতে দিয়ে বললেন, এটা উড্রো সাহেবের হাতে দিয়ে কলেজে যাস্। সেইমত শিবনাথ উড্রো সাহেবের ঘরে প্রবেশ করে নমস্কার করলেন। চিঠিটা উড্রো সাহেবের হাতে দিতে গিয়ে বাধা পেলেন তিনি। সাহেব বললেন, তোমার পায়ে চটিজুতো, বাইরে খুলে এসো। তারপর তোমার হাত থেকে চিঠি নেব। শিবনাথ বললেন, আপনার ঘরে ঢুকতে হলে জুতো খুলতে হয়—একথা জানতাম না। জুতো খুলতে হলে আমি আপনার ঘরে ঢুকতাম না। 'ব্যাপারখানা এই। তখন আমার এমনি দারিদ্র্য ও দুরবস্থা যে, আমাকে চটিজুতাই সর্বদা পরিতে হইত। বুটজুতা পরা ভাগ্যে ঘটিত না। সুতরাং সেদিন চটিজুতা পায়ে দিয়াই কলেজে যাইবার পথে সাহেবের আপিসে গিয়েছিলাম। তাহা দেখিয়াই সাহেব চটিয়াছিলেন।

সাহেব। তুমি জুতা পরিয়া এঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে অপমান করিয়াছ। তুমি জুতা খুলিয়া এস।

আমি। না সাহেব, আমি জুতা খুলিব না। আমি কিরূপে আপনার অপমান করিলাম, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার পায়ে জুতা রহিয়াছে, আপনার কেরানি বাবুর পায়ে জুতা দেখিতেছি। আপনারা যদি খোলেন, তবে আমি খুলিতে পারি।

সাহেব। ও যে বুট জুতা।

আমি। বুট জুতা পায়ে দিয়ে এলে আপনার মান থাকিত, আর চটি জুতা পায়ে দিয়া আসাতে মান গেল, এ নূতন কথা; ইহা আমি কিরূপে বুঝিব?

সাহেব। হ্যাঁ, আমার আফিসের এ নিয়ম আছে, তাহা তুমি কি জান না?

আমি। না সাহেব, আমার জন্মে আমি এমন নিয়ম শুনি নাই।

সাহেব। তুমি জুতা খুলিবে কি না, বল।

আমি। না সাহেব, খুলব না।

সাহেব। তবে তোমার চিঠি নেব না।

আমি। এই কাগজ আপনার ডেস্কের উপর রইল। ও আপনাদেরই কাগজ। নেন নেবেন, না নেন না নেবেন। আমার কাজ আমি করে গেলাম।'

কিন্তু না, এখানেই শেষ নয়। শিবনাথ সাহেবের ঘর থেকে বেরুতে যাবেন, অমনি সাহেবের ডাক—শোন, দাঁড়াও। শিবনাথ দাঁড়ালেন। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, রাজা রাধাকান্ত দেব অসুস্থ, আমি তাঁকে দেখতে যাচ্ছি, তুমি যাবে আমার সঙ্গে? শিবনাথ বললেন, না সাহেব, আমার কলেজ আছে।

আচ্ছা, আমার একটা কথার জবাব দাও—বললেন সাহেব—'রাধাকান্ত দেবের ঘরে ঢুকতে গিয়ে তুমি কি জুতো প'রে যাবে?

'না'—দৃঢ় কণ্ঠস্বর শিবনাথের—কারণ রাধাকান্ত দেব বাঙালি। বাঙালি ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় জাজিম পাতা থাকে, সবাই জুতো খুলে প্রবেশ করে, সুতরাং আমিও জুতো খুলেই ঢুকবো।

অবশ্যই উড্রো সাহেব শিবনাথের একথায় বিরক্ত হয়েছিলেন। শিবনাথ কিন্তু জুতো কোথায় খুলবেন আর কোথায় খুলবেন না, তার কারণ খুঁজেছিলেন। সাহেবের 'কেন'-র উত্তর ঠিক মতই দিয়েছিলেন তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে।

ভবিষ্যৎ সমাজ-সংস্কারক, ব্রাহ্মধর্মের একনিষ্ঠ সাধক, দৃঢ়চেতা মনস্বী-সাহিত্যিকের বাল্যকাল কত বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে কেটেছে, এখানে তার সামান্য পরিচয় তুলে ধরা হলো। শিবনাথ দেহত্যাগ করেন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর, কলকাতায়।

নবীনচন্দ্র সেন

জন্ম : ১৮৪৭ ।। মৃত্যু : ১৯০৯

মা বলতেন, এমন দুরন্ত-বেয়াড়া ছেলেকে নিয়ে আমার কি হবে? রায়বংশের কুলাঙ্গার। ঠাকুরমা দেবতার কাছে প্রার্থনা করতেন, ছেলে যেন মায়ের কাছে না যায়। মা তাঁর শাশুড়িকে বলতেন, আপনার অযথা আদরে ছেলে আমার এত জেদি, এত বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে।

হয় হোক, একদিন দেখবে এই ছেলেই গোপীর নাম উজ্জ্বল করবে।

কতই বা বয়স তখন নবীনের। আড়াই বছর বয়স। ঠাকুরদা-ঠাকুরমার চোখের মণি। নবীন যখন যা বলেছেন, ঠাকুরদা সঙ্গেই সঙ্গেই তাই করেছেন। সেবার চট্টগ্রামে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হলো। মুষলধারায় বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল দৈত্যের মত ঝড়ের দাপট। নয়াপাড়া গ্রাম জলে ভাসছে, ঝড়ে বহু বাড়িঘর পড়ে গেছে। নবীনের সাধ হলো এই ঝড়ে ঘুড়ি ওড়াবেন। ঝড়ে নাকি ঘুড়ি ওড়ে ভালো। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ঠাকুরদা লাঠির মাথায় তার, তারের মাথায় কাগজ বেঁধে দিয়ে ঘুড়ি তৈরি করে দিলেন। মহা আনন্দ বালক নবীনচন্দ্রের। সঙ্গে সঙ্গে অন্য আবদার শুরু হলো। উঠোনের বৃষ্টির জমা-জলে বড়শি ফেলবো। ঠাকুমা সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝড়ের মধ্যেই পড়ে-যাওয়া ঘরের এক কোণে গিয়ে ছিপ হাতে পৌত্রের আবদার রক্ষা করলেন।

অতএব মা রাজরাজেশ্বরীর ধার ধারে কোন্ ছেলে!

চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রামের বিখ্যাত জমিদার বংশের রায়-পরিবারে নবীনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুআরি। পিতা গোপীমোহন রায় এবং মাতা রাজরাজেশ্বরী দেবী।

পাঁচ বছর বয়সে নবীনচন্দ্রের হাতে-খড়ি হলো। বাড়িতে লেখা-পড়া আর পাড়ায় দুষ্টুমী—দুটিই সমান গতিতে এই বয়সেই চলতে লাগলো। ঠাকুমার আদর বালক নবীনচন্দ্রকে সকল রকম বিপদ থেকেই উদ্ধার করতে লাগলো। কাউকেই ভয় করেন না, পাড়া-প্রতিবেশী বালকের অত্যাচারে পীড়িত। বাপ-মাকে নালিশ করতে গেলে, ঠাকুরমার কাছ থেকে দু'কথা শুনে আসেন তাঁরা। তাছাড়া এ নিয়ে তাঁরা বেশি বাড়াবাড়িও করেন না। কারণ নবীনের বাবা গোপীমোহন চট্টগ্রাম জজ আদালতের পেসকার। দান-ধ্যানে মুক্তহস্ত। কত অসহায় প্রতিবেশী সংসার চালান গোপীমোহনের অর্থদাক্ষিণ্যে।

কিন্তু ভয় করেন তিনি একজনকে! তিনি নবীনচন্দ্রের বড় কাকা মদনমোহন। একরোখা, ফুলবাবু মদনমোহনও কাউকে পরোয়া করতেন না। সবাই চাকরি করতে যায় পায়ে হেঁটে, তিনি যেতেন পাল্‌কি চড়ে। মদনমোহন শিক্ষানবিশী করতে যেতেন এক মুসলমান মুনসেফের সেরেস্তায়। মুনসেফ আসতেন হেঁটে তাঁর কাছারিতে। মদনমোহন যেতেন পাল্‌কি চড়ে। কেউ কিছু বললে বলতেন, পালকির খরচ তো আপনাদের পিতা বহন করেন না!

ব্যস্। সবাই চুপ!

এমনি এক খুড়োর ভাইপো নবীনচন্দ্র। দেশশুদ্ধ লোক যেমন খুড়ো মদনমোহনকে ভয় করতো, তেমনি প্রতিবেশীরা এড়িয়ে চলতো ভাইপো নবীনচন্দ্রকে।

কিন্তু যেমন কুকুর তেমনি মুগুর! একদিন কাকার ছিপ ভেঙে ফেলেছিলেন নবীন। ব্যস, সেই ভাঙা ছিপের আগা দিয়ে উত্তম-মধ্যম প্রহার করলেন কাকা তাঁর ভাইপোকে। কারুর বাধাই তাঁকে নিরস্ত করতে পারলো না।

সেই বড় কাকাই আট বছর বয়সে নবীনকে নিয়ে চলে এলেন চট্টগ্রাম শহরে। উদ্দেশ্য, গ্রামে থাকলে ভাইপো মানুষ হবে না। পড়াতে গেলে শহরই একমাত্র জায়গা। গাড়ি-ঘোড়া, হাতি, পাকা বাড়ি, দোকানের সারি আর উঁচু পাহাড়ের চূড়ো বালক নবীনচন্দ্রকে মুগ্ধ করে ফেললো।

এই শহরেই বাবার চাকরি। জজ আদালতের পেস্কার তো নয়, যেন নিজেই একজন যম। যেমন রাশভারি, তেমনি তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাঁরই বড় ছেলে নবীনচন্দ্র।

সকাল বেলায় পূজায় বসেন বাবা। বৈঠকখানা লোকে লোকারণ্য। কাপড়ের বস্তা নিয়ে হিন্দুস্থানী কাপড়ওয়ালা এসেছে, এসেছে খাতা হাতে দোকানদাররা, এসেছে উমেদারির দল, অর্থপ্রার্থী। কোনো কোনো দিন দু'একজন সদর-অলা মুনশেফ, আমীন; বহুদূর থেকে এসেছে ব্রাহ্মণগণ। সব সময় যেন বৈঠকখানা গম্‌গম্‌ করছে। বালক নবীনচন্দ্রেরও আদর তাদের কাছে অনেক। সন্ধেবেলায়ও বৈঠকখানা সরব গান-বাজনায়। ঘরের এক কোণে একদল তাস খেলছে, অন্য কোণে চলছে দাবার চাল। মামলায় যারা জিতেছে, তাদের কারুর হাতে বড়-বড় ঝুড়িভর্তি সন্দেশ, কেউ এনেছে বড়-বড় মাছ, আবার কেউ এনেছে গোটা দুই খাসী।

বিদ্যুৎগতিতে আনন্দে আনন্দে কেটে গেল নবীনচন্দ্রের গোটা তিনেক বছর।

কিন্তু সুখ তো আর সব সময়ে দাঁড়িয়ে থাকে না এক জায়গায়! প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে কাকা মারা গেলেন একদিন। তখন নবীনচন্দ্রের বয়স এগারো-বারো বছর বয়স। যে-কাকার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া-শোওয়া, শিকার করা অর্থাৎ ছায়ার মত যাঁকে অনুসরণ করতেন বালক নবীনচন্দ্র, সেই কাকা একদিন নবীনকে নিঃসঙ্গ করে মারা গেলেন।

কাকার শোকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন নবীনচন্দ্র। প্রায় এক বছর স্কুলে যেতে পারলেন না। বাড়িতে পড়াশোনা করেই পরীক্ষা দিয়ে

পঞ্চম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠলেন তিনি। শৈশব থেকেই কবিতা শুনতে ভালবাসতেন। ছোট ছোট কবিতাও লিখতেন। তাঁর সে-সব শিশুসুলভ কবিতা শুনে স্কুলের পণ্ডিতমশাই জগদীশ তর্কালঙ্কার বালক নবীনচন্দ্রকে উৎসাহ দিতেন। এ সময়ে তিনি এত দুষ্টু ছিলেন যে, স্কুলে তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল 'দুষ্টু শিরোমণি'।

সেদিন চট্টগ্রামের সেই স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক কেউ ভাবতেই পারেননি যে এই 'দুষ্টু শিরোমণি' বালকটি একদিন বাংলা কাব্য-জগতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন! তাঁর বাপ-মাও কি ভাবতে পেরেছিলেন, ছেলে তাঁদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবে? 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'ভারত-উচ্ছ্বাস' (১৮৭৫), 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬) প্রভৃতি কাব্য রচনা করে কবি নবীনচন্দ্র একদিন বাংলার কাব্যজগতকে মাতিয়েছিলেন। লোকের মুখে মুখে সেদিন নবীনচন্দ্রের কবিতার লাইন ঘোরাফেরা করতো। সেদিন কে পড়েননি 'পলাশীর যুদ্ধে'র সেই কবিতা? —'ধন্য আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়! মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন!' অথবা, 'এই কলির সন্ধ্যা; প্রগাঢ় তিমিরে। এখনো বঙ্গের মুখ হয় নি আবৃত।'

স্কুলে থাকতেই 'গোঁয়ার' নবীনচন্দ্রের একটা ডানপিটে-দল ছিল। তারা করতে পারতো না, এমন কাজ ছিল না। ফলে যেখানে যত গণ্ডগোল বাধতো, পণ্ডিত মশাইরা এসে পাকড়াতেন নবীনকে।—তুই করেছিস, তোর দল ছাড়া আর কারুরই এ কম্মো নয়—এমন সব অভিযোগ তুলে অনেকদিন নবীনচন্দ্রকে শাস্তি পেতে হয়েছে।

আর তাঁর দলের ছাত্র? তারা সব ছিলেন তখনকার দিনের বড়-বড় সরকারী অফিসারের পুত্র নতুবা আদালতের জজ, পেস্কার প্রমুখের অভিজাত সন্তান। এরাই নবীনচন্দ্রের 'বডিগার্ড'। ঠাকুরমার আদুরে ছেলে নবীনচন্দ্র নিজের মা-কেও কেয়ার করতেন না। একদিন মা বকলে নবীন এক শিশি স্মেলিংসল্ট খেয়ে ফেলেছিলেন।

আর একদিন বাবার পিস্তল দিয়ে পাখি শিকার করতে গিয়ে বাম চোখটি জখম করে দীর্ঘদিন আধা-অন্ধ হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আরও ছোট থাকতে কচুগাছ কাটতে কাটতে ডান হাতের একটা আঙুলই কেটে ফেলেছিলেন। সেই ছেলে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করলেন। শুধু পাশই নয়, সব বিষয়ে ভালো নম্বর পাওয়ায় ছাত্রবৃত্তিও পেলেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী, স্কুলের শিক্ষকমশাইরা —কেউ যেন এ-খবরে বিশ্বাস কয়তে পারছিলেন না। 'বড়লোকের বখাটে ছেলের কিচ্ছু হবে না' বলে যাঁরা নবীনচন্দ্রের দিকে আঙুল তুলে দেখাতেন, তাঁদের মুখে এক ধামা মাছি। যে-ছেলের জ্যাঠামিতে একখানি 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড' রচিত হতে পারতো সে-ই ছেলে কিনা বৃত্তি পেয়ে এনট্রান্স পাশ করলো!

আসলে, যত বড় দুষ্টুই হোন না কেন, সময় মতো লেখাপড়ায় কোনো দিন অবহেলা করেননি নবীনচন্দ্র। সারাদিন দুষ্টুমি করে, খেলার মাঠে কাটিয়ে, পাহাড়ে পাখি শিকার করে বেড়ালেও অধিকাংশ দিন সারা রাত্রি কেটে যেত তাঁর পড়াশোনায়।

নবীনের বাবার এক বন্ধু ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তাঁর মতো বাংলা ভাষা লিখতে ভূভারতে আর কেউ পারে না। বিদেশে চাকরি করতেন। যখন ছুটিতে দেশে আসতেন তখন বন্ধুপুত্র নবীনচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের বন্ধু চন্দ্রকুমারকে নিয়ে পড়তেন। এঁর সঙ্গে নবীনচন্দ্রের কি রকম মধুর সম্পর্ক ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন নবীনচন্দ্র নিজেই—'তিনি বিদেশে চাকরি করিতেন, তাই আমাদের রক্ষা। ···দেশে আসিলে আমাকে আর চন্দ্রকুমারকে বড়ই জ্বালাতন করিতেন। পথে-ঘাটে যেখানেই আমাদিগকে পাইতেন, পরীক্ষা করিয়া লইতেন।

একদিন ঊর্ধ্বশ্বাসে ক্রীড়াভূমে ছুটিয়াছি; তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ। যেই সাক্ষাৎ, সেই প্রশ্ন—সন্ধি কাহাকে বলে? অমনিই বলিলেন,— যদি উত্তর দিতে না পার, তবে কান মলিয়া দিব।

আমি দেখিলাম, ইঁহার সঙ্গে আর ভদ্রতা করিলে চলিবে না। বলিলাম—তাহারই নাম সন্ধি, কর্ণের সঙ্গে করের সংযোগ।.

বারুদস্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িল। তিনি গর্জন করিয়া আমাকে নানা স্বরে বহুবার 'বেল্লিক' উপাধি দিয়া বাললেন,—আমার সঙ্গে ঠাট্টা? তোমার বাবার কাছে বলিয়া পাঠাইব, যেন কান দু'খানি কাটিয়া দেন।

উত্তর—একরূপ ভাল। কানমলা আর খাইতে হইবে না।—এই বলিয়া আমি ছুটিলাম। আমি জানিতাম যে, আমার কানখানি এত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে যে, পিতা কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিবেন। এ-যাত্রা একপ্রকার নিষ্কৃতি পাইলাম।'

এমন ঘটনা নবীনচন্দ্রের বাল্যকালে অনেক।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে নবীনচন্দ্র কলকাতায় এলেন কলেজে পড়তে। নবীনচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে 'যমালয়' বলে ঠাট্টা করতেন। চ্যানসেলার স্বয়ং 'যম', রেজিস্ট্রার হলেন 'চিত্রগুপ্ত', সিণ্ডিকেট 'যমদূতসমিতি', আর পরীক্ষা? নবীনচন্দ্রের কাছে পরীক্ষা হলো 'বৈতরণী'। তাঁর মতে, আট বছর থেকে শুরু করে বাইশ বছর পর্যন্ত কেবলই পরীক্ষা। যমালয়ে যেতে হলে একবারই মরতে হয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হলে এই দীর্ঘ সময়ে প্রতি বছর একবার করে মরতে হয়।

আশ্চর্য, সেই পরীক্ষাতেই ভালো ভাবে পাশ করে কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ, (ফার্স্ট আর্টস্)-তে ভর্তি হলেন। হাতে মাসিক বৃত্তির কুড়ি টাকা। পিতা গোপীমোহনের ইচ্ছা ছিল না, বিদেশে একা থেকে পুত্রের পড়াশোনা করার। শেষ পর্যন্ত বাবা-মা চোখের জলে বড় আদরের ছেলেকে কলকাতায় পাঠালেন। নবীনের জিদ্—আরো পড়াশোনা করে আমাকে অনেক বড় হতে হবে! সেই জিদের কাছে পিতাও হার মানলেন। নবীনচন্দ্রের সঙ্গে এলেন বন্ধু চন্দ্রকুমার। চাট্গেঁয়ে-ছেলে। কথায় পুরোপুরি চট্টগ্রামের টান। অর্থাৎ 'বাঙ্গাল'। শহুরের ছেলেরা কখনো তাঁকে ডাকতো 'বাঙ্গাল,

কখনো 'চাটগেঁয়ে ভূত'। নবীনচন্দ্রের কিন্তু তাতে দুঃখ বা অপমান কিছুই হতো না। নির্বিবাদে সকলের সঙ্গে চাটগেঁয়ে ভাষায় অনর্গল কথাবার্তা বলতেন এবং সবাই তাঁকে নির্বিচারে বন্ধুভাবে গ্রহণ করলো।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ.এ. পাশ করলেন নবীনচন্দ্র। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে আর পড়া হলো না। বি.এ. পড়তে ভর্তি হলেন জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লি কলেজে (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ)। দেশের বাড়ির অবস্থা খারাপ হয়ে এলো। বাবা গোপীমোহনের আয়ও কমে এসেছে। বাধ্য হয়ে নবীনচন্দ্র কলকাতায় দুটি টিউশানি করেন। বিনিময়ে কুড়ি টাকা বেতন। ফলে কলেজের খরচ চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়লো। বাবা অবশ্য মাঝে-মধ্যে কিছু করে টাকা পাঠাতেন ছেলেকে। কিন্তু তাতেও স্বাচ্ছন্দ্য এলো না। পটুয়াটোলায় বাসা। ছেলে পড়াতে যেতে হয় সকালে সিমলায়, সন্ধ্যাবেলায় বড়বাজারে। তার ওপর আছে পটুয়াটোলা লেন থেকে হেঁটে হেঁদোর ধারে কলেজ। প্রতিদিন প্রায় বারো-তেরো মাইল রাস্তা হাঁটতে হতো তাঁকে। রাতে অবসন্ন হয়ে যখন বাসায় ফিরতেন তখন বইয়ের পাতা খোলার আগে চোখের পাতা ঘুমে বুজে আসতো।

বিধাতার কি নির্মম পরিহাস। অবস্থা-দুর্বিপাকে কলেজের বই কেনার টাকা পর্যন্ত নেই। বাবাকে লিখলে হয়তো পাঠাতেন, কিন্তু নবীনচন্দ্র ভালো করেই জানেন, সেটাকা বাবা কর্জ করে পাঠাবেন। তাই নবীনচন্দ্র টাকার কথা কখনই লিখতেন না বাবাকে। সব সময়ে লিখতেন, আমার পড়ার খরচ নির্বিঘ্নে চলে যাচ্ছে, আপনার টাকা পাঠাবার প্রয়োজন নেই।

পাঠ্য বই মাত্র দু'খানি কিনলেন তিনি। অন্যান্য বই সহপাঠীদের সুবিধা মতো চেয়ে-চিন্তে পড়তে লাগলেন। কলেজে পড়ার সময়ে (১৬৮৭ খ্রী.) নবীনচন্দ্র তাঁর পিতাকে হারালেন। আর্থিক চরম দুর্দশার সঙ্গে শুরু হলো মানসিক অশান্তি। যেন অকূল সমুদ্রে পড়লেন

তিনি। এই অবস্থার মধ্যেও মনকে শক্ত করে বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়ে (১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) নবীনচন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পাশ করলেন।

বাবা তো একটি পয়সাও রেখে যাননি তাঁর বড় ছেলের জন্য, উপরন্তু বাবার সমস্ত ঋণের বোঝা এসে চাপলো নবীনচন্দ্রের মাথায়। এই বয়সেই কঠিন বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে করতে একদিন নবীনচন্দ্র কবি নবীন সেন হলেন আর হলেন ন্যায়নিষ্ঠ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেসব কথা অনেক পরের।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জানুআরি কবি-মনীষী নবীনচন্দ্রের দেহত্যাগ হয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম: ১৮৬৫ ॥ মৃত্যু: ১৯৪৩

বাংলা মাসিক পত্র 'প্রবাসী' (প্রকাশ: ১৯০১) আর ইংরেজি 'মডার্ন রিভ্যু' (প্রকাশ: ১৯০৭)-এর নাম আজ কে-না জানে? ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য—সকল বিষয়ের উন্নতির জন্যে এই দুটি পত্রিকার মাধ্যমে যিনি সারাটি জীবন সংগ্রাম করে গেছেন—তিনি মানবপ্রেমী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

পৃথিবীতে যারা ঈশ্বরের সকল বিশেষ দান থেকে বঞ্চিত, মানুষের ভালোবাসা থেকে যারা দূরে—বহু দূরে, তাদেরই প্রতি রামানন্দের মমতা। কর্মযোগী রামানন্দ, ধর্মবিশ্বাসী রামানন্দ আমৃত্যু লড়াই করেছেন অসত্য, অবিচার আর অশুচির বিরুদ্ধে। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে 'দাসী', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভ্যু'র সাহায্যে সেই সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজা করে গেছেন। সিস্টার নিবেদিতা তাই সেদিন বলেছিলেন: 'ভারতের অন্তরের ব্যথাকে প্রকাশের ভার তাঁকেই (রামানন্দকে) ঈশ্বর দিয়েছেন। শুধু বাংলার কথা বলেই তাঁর নিষ্কৃতি নেই, তাঁকে বলতে হবে সমগ্র ভারতের কথা। সকল জগতের কথাও তাঁর ভুললে চলবে না। তিনি বাঙালি, তিনি ভারতীয়, তিনি বিশ্ববাসী।'

বাঁকুড়ার পাঠকপাড়ায় ২৯ মে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম হরসুন্দরী। মায়ের চারিত্রিক আদর্শের প্রভাব বেশি মাত্রায় পড়েছিল শিশু

রামানন্দের ওপর। মাতা হরসুন্দরী ছিলেন ধর্মশীলা ও কর্মপটু। স্বামীর অবস্থা সচ্ছল থাকলেও হরসুন্দরী কোনো দিন বড়মানুষী দেখাননি। কাপড়-চোপড়, বেশভূষা, খাওয়া-দাওয়া, চালচলন, আচার-ব্যবহার—কোনো কিছুতেই তাঁর আড়ম্বর ছিল না। স্নেহ, কর্তব্য-পরায়ণতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা রামানন্দ পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছ থেকেই। রামানন্দের এক ভাইপো সেই যে বলেছিলেন : 'কার পুণ্যে কাকা আমাদের বংশে জন্মেছিলেন। তবে কারও পুণ্যে যদি কেউ জন্মগ্রহণ করে, তবে বলবো কাকা মহাশয় ঠাকুরমার সাধনার ধন।'—এ কথা যে কত বড় সত্যি, তা রামানন্দের জীবনে উপলব্ধি করা যায়। রামানন্দ ছিলেন তাঁর পিতামাতার পঞ্চম সন্তান।

পাঁচ-ছয় বছর বয়সে রামানন্দের অক্ষর-পরিচয় হয় তাঁরই সেজ জ্যাঠামশাই শম্ভুনাথের টোলে। সেখানে শুধু সংস্কৃত পড়ানো হতো। তাই 'দশের বাঁধ' নামে একটি পুকুর-পাড়ে বাংলা স্কুলে তাঁকে অ-আ-ক-খ লিখতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু একদিনের বেশি রামানন্দ সে-স্কুলে যাননি। ছোটো থাকতেই তাঁর উপনয়ন হয়।

বাঁকুড়ায় তখন ইংরেজি ও বাংলা—দুরকম স্কুলই ছিল। বাংলা স্কুলের ছাত্রেরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিত। রামানন্দও ভর্তি হলেন একটি বাংলা স্কুলে। যথাসময়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাও দিলেন। অনেক বেশি নম্বর পেয়ে পাশ করলেন এবং মাসিক চার টাকা বৃত্তি পেলেন। আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, পাঠে মনোযোগী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী রামানন্দ ক্লাশে কয়েকবার ডবল প্রমোশনও পেয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স দশ। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেবার আগে তাঁর পাঠ্য ছিল বীজগণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, বাংলা সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য প্রভৃতি। তাঁর নিজের কথায় : 'আমরা অনেকে বাল্যকালে দশ-এগার বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য বাংলা ভাষায় যাহা শিখিয়াছিলাম, ইংরাজী স্কুলের ছেলেরা এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্য পনর-ষোল বৎসর বয়সে ইংরাজী ভাষায় তাহা অপেক্ষা বেশি শিখিত না—এখনও বোধহয় শিখে না।'

পাঠ্যপুস্তক 'পদ্যপাঠ'-এর কবিতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?' কবিতাটি বালক রামানন্দের রক্তে দোলা দিয়ে যেত। 'সদ্ভাবশতক'-এর কবিতা 'চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে' কবিতা বালকের মনে সুন্দর অনুভূতি জাগিয়ে দেয়।

ছোট বয়সে রামানন্দ ছিলেন অত্যন্ত শান্তস্বভাবের। পাড়ার দুর্দান্ত দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মিশতেন না। হা-ডু-ডু খেলা তাঁর প্রিয় খেলা। বড় সংসার তাঁদের। লোকজনও বাড়িতে অনেক। সকালে উঠেই পড়াশোনা শেষ করে স্কুলে যাবার আয়োজন। বাড়িতে রান্নার লোক ছিল না, ছিল না নদি থেকে জল তুলে আনার। সবই করতে হতো মা হরসুন্দরীকে। ফলে সকাল বেলা সকল কাজ করে রান্নাঘরে যেতেই অনেক বেলা হয়ে যেত। তাই প্রায় দিনই দুপুরে রামানন্দের খাবার জুটতো পাতায় করে পোস্ত পোড়া আর ভাত। সঙ্গে থাকতো বড় এক বাটি দুধ। এই সাধাসিধে খাওয়াতেই খুশি হয়ে বালক রামানন্দ স্কুলে চলে যেতেন। কখনো অনুযোগ করেননি মায়ের কাছে, এ নিয়ে।

বাঁকুড়ার প্রাকৃতিক শোভা অপূর্ব শাল-পলাশের শোভা, শুশুনিয়া পাহাড়ের গাম্ভীর্য বালক রামানন্দের মনে এক অদ্ভুত শিহরণ জাগিয়ে দিত। পল্লী-বালক রামানন্দ। লক্ষ্মী আর সরস্বতী পুজোর সময়ে বনে-বনে ফুল কুড়োবার আনন্দ, এমন কি বন্ধুদের সঙ্গে দল-বেঁধে চণ্ডীদাসের জন্মভূমি সেই দূর ছাতনা গ্রামের শালবনে গিয়ে বুনো ফুল-সংগ্রহের আনন্দ—তিনি কোনো দিনই ভোলেননি।

বাংলা স্কুলে পড়ার সময়ে, যখন তাঁর দশ বছর বয়স তখন স্কুলে কবিতা-রচনার এক পরীক্ষা হয়। রামানন্দ কবিতা রচনা করে প্রথম হলেন এবং দশ টাকা পুরস্কার পেলেন। শিশুবয়সের এই কবিতা-রচনার কথা বড় হয়ে রবীন্দ্রনাথকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে গল্প করছিলেন। রামানন্দ বললেন, আমি বাল্যকালেই দশ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলাম কবিতা লিখে। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন,

আপনি মশাই, দশ বছরেই পুরস্কার পেয়ে গেলেন বলেই তো আপনার আর জীবনে কবিতা লেখা হলো না। আর আমি পঞ্চাশ বছরের আগে কোনোই পুরস্কার পাইনি বলে আজীবন কবিতাই লিখে গেলাম।

অপূর্ব উত্তর।

রামানন্দ শিক্ষকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। শুধু ভালো লেখাপড়া করার জন্যে নয়, সত্যবাদিতা, সাধাসিধে চালচলন, সুন্দর ব্যবহার—সব শিক্ষকেরই মন কাড়তো।

তখনকার দিনে জাতিভেদ-প্রথা এত বেশি ছিল যে, অনেক সময়ে বালক রামানন্দ এ-নিয়ে বিপদে পড়তেন। একবার বাংলা স্কুলে পড়ার সময়ে, রামানন্দের এক সহপাঠী পাশে-বসা বন্ধু রামানন্দকে বললো, ওরে, আমার পিঠটা খুব চুলকোচ্ছে। একটু চুলকে দে না!

রামানন্দ বন্ধুর পিঠ চুলকে দিতেই শিক্ষক এসে দুম্ করে রামানন্দের পিঠে মারলেন এক কিল! রামানন্দ তো ভ্যাবাচ্যাকা! অবাক্ বিস্ময়ে শিক্ষকমশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভাবখানা—বন্ধুর পিঠ চুলকাচ্ছি তো অপরাধ করলাম কোথায়?

শিক্ষকমশাই ধমকে উঠলেন, পাজি, হতভাগা, তুই ব্রাহ্মণ হয়ে ছুতোরের ছেলের পিঠ চুলকোচ্ছিস্?

বালক রামানন্দ আরও অবাক্। আমি চাটুজ্জে আর ও ছুতোর। তার জন্যে এই ব্যবধান। বন্ধু ছুতোরের ছেলে বলে ওর পিঠটাও চুলকোতে পারবো না? ছোটবেলা থেকে সেই যে মুখস্থ-করা লাইনটি—তাঁদের জন্মভূমির এক কবি চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—এইসব শিক্ষকদের ওপর কি কোনো প্রভাবই ফেলতে পারেনি?

না, পারেনি। বড় হয়ে পরবর্তী জীবনে রামানন্দের তাই সংগ্রাম ছিল এই জাতিভেদের বিরুদ্ধে।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় চার টাকা বৃত্তি পেয়ে রামানন্দ ভর্তি হলেন ইংরেজি স্কুলে। পড়াশোনা ফ্রি। বড়দা তাঁকে মাঝে-মাঝে দু'চার

টাকা হাতখরচ দিতেন। সে-টাকাটা জমিয়ে রেখে তাঁর মেজদার বইপত্র কেনায় খরচ করতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি স্বাবলম্বী। বাঁকুড়ায় তখন কেশব সেনের 'সুলভ সমাচার' (প্রথম প্রকাশ : ১২৭৭) পত্রিকা আসতো। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল এক পয়সা। বালক রামানন্দ স্বপ্ন দেখতেন, বড় হয়ে এমন একখানা সুন্দর পত্রিকা বার করবেন।

বাঁকুড়া জেলা স্কুলের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন কেদারনাথ কুলভী। তাঁর উপদেশ ও আদর্শ বালক রামানন্দকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে। তিনি খুব কঠোর-প্রকৃতির লোক ছিলেন। ছেলেরা অঙ্কে ভুল করলে তিনি খুবই রেগে যেতেন। একদিন ক্লাশে একটি ছাত্র জ্যামিতিতে ভুল করলো। বড়লোকের ছেলে। সুন্দর সাজগোজ। মাথায় চুলের সিঁথি সরল রেখায় পরিপাটি করে কাটা। কেদারনাথবাবু শক্তমলাটে বাঁধানো হাতের সেই জ্যামিতি বইটি ছুঁড়ে মেরে দিলেন ছাত্রটির মাথায়। চিৎকার করে উঠলেন, 'yor cau bisect your head and you can't bisect a straight line!' অর্থাৎ, সোজা সিঁথি কেটে তোমার মাথাটাকে দু'ভাগ করতে পারো, আর একটা সরল রেখাকে দু'ভাগ করতে পারো না?

এই শিক্ষকের প্রভাব রামানন্দের জীবনে অসীম। কেদারনাথবাবু ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। এবং রামানন্দ ছিলেন তাঁর প্রিয়তম শিষ্য। রামানন্দ নিজেই বলেছেন, 'আমি যখন ইংরেজি স্কুলের উপর ক্লাসে পড়ি তখন থেকেই আমার ব্রাহ্মধর্মের প্রতি ঝোঁক ছিল ও ব্রহ্মমন্দিরে যাতায়াত ছিল। সেই জন্য আমার উপর বাড়ির লোকদের অসন্তোষ ছিল। তবে আমাকে কেউ কিছু বলতেন না। মা তো বলতেনই না। তিনি সরল প্রকৃতির ভালমানুষ ছিলেন।'

বাল্যকালেই দরিদ্র ছাত্রদের জন্যে নিজের বাড়িতেই একটি স্কুল খুললেন। ঠিক হলো, কয়েক জন সহপাঠী তাঁর সহায় হবেন। বাড়িতে একটা কাঠের সিঁড়ি ছিল। সেই সিঁড়ির ওপর দিক থেকে প্রতি ধাপে ধাপে খড়ি দিয়ে লেখা হলো ১, ২, ৩, ৪ সংখ্যা। অর্থাৎ ১-সংখ্যক ধাপ হলো ১ম শ্রেণী, ২য় সংখ্যক হলো ২য় শ্রেণী, ৩য় সংখ্যক হলো

৩য় শ্রেণী ইত্যাদি। কোনো ছেলে যদি পড়া না পারতো বা দুষ্টুমি করতো তাকে একেবারে শেষ ধাপে নামিয়ে দেওয়া হতো। রামানন্দ স্থির করলেন, এই দরিদ্র ছাত্রেরা গুরুদক্ষিণা হিসাবে মাসে একটি করে সুপারি দেবে। এ-স্কুল বেশ কিছুদিন চলেছিল। এই আদর্শে বড় হয়ে রামানন্দ বাঁকুড়ার ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে নৈশবিদ্যালয় খুলেছিলেন।

ছাত্র-অবস্থাতেই নানান সংস্কারমুখী মন নিয়ে তিনি অনেক ভালো কাজ করেছেন।

তখনকার জেলা স্কুলে স্কুলের পরিদর্শক হয়ে আসতেন সব স্বনামধন্য ব্যক্তি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় আসতেন, আসতেন তৎকালীন বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্রজেন্দ্রনাথ দে। প্রসিদ্ধ লেখক ও আই.সি. এস. রমেশচন্দ্র দত্তও ছিলেন এক সময়ে বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনিও মাঝে-মধ্যে জেলা স্কুলের ছাত্রদের ইংরেজি পরীক্ষা করতে যেতেন। ভালো ইংরেজি বলতে পারা ও লিখতে পারা এই পরীক্ষার অন্তর্গত ছিল। একবার ছাত্রদের বাঁকুড়া সম্বন্ধে ইংরেজিতে রচনা লিখতে বলেছিলেন রমেশচন্দ্র। রামানন্দ রচনার মধ্যে একটি লাইন লিখেছেন, 'Chandidas, the foremost poet of Bengal, was the glory of Bankura'। রমেশচন্দ্র রচনাটি দেখে এত খুশি হয়েছিলেন যে, তাঁকে একশ'র মধ্যে ছিয়ানব্বই নম্বর দিয়েছিলেন। তা দেখে তো স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল। হেডমাস্টার চন্দ্রনাথ মৈত্র বললেন, আপনার মতো ইংরেজি-জানা লোকের কাছ থেকে এত নম্বর পেলে ছেলেটির মাথা বিগড়ে যাবে, নম্বর কিছু কম করে দিন। রমেশচন্দ্র মাথা নাড়লেন, উহুঁ, আমি কি করবো? হয়তো ছেলেটি মুখস্থ করে লিখেছে অথবা ইংরেজি বেশ ভালোই জানে। আমি তো রচনার মধ্যে ভুল কিছুই পাইনি, নম্বর কমাবো কি করে? হেডমাস্টার খুব শক্ত লোক। বললেন, এরকম করলে ভবিষ্যতে এদের উন্নতি হবে না। অগত্যা হেডমাস্টারের পীড়াপীড়িতে ও তাঁর অনুরোধ রক্ষার জন্যে রমেশচন্দ্র

ছ'টি নম্বর কেটে দিয়ে নব্বই করে দিলেন। রামানন্দকে বিশেষ পুরস্কার-স্বরূপ 'Maunders' treasury of History' বইটি তিনি উপহার দেন। বহু বছর পরে যখন রামানন্দ ইংরেজির অধ্যাপক হয়েছিলেন, তখন একদিন সেই বইটি রমেশচন্দ্রকে দেখান। রমেশচন্দ্র বলেছিলেন, দেখুন, আমি কেমন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। আপনার ইংরেজি লেখা দেখে পুরস্কার দিয়েছিলাম, আপনি এখন সেই ইংরেজিরই অধ্যাপক।

রামানন্দের যখন চৌদ্দ-পনের বছর বয়স তখনই তিনি চিঁড়ে-মুড়ি কাপড়ে বেঁধে নিয়ে হেঁটে দূরে মামার বাড়িতে যেতেন। হাঁটতে তার বিন্দুমাত্র কষ্ট হতো না।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সসম্মানে ৪র্থ স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হলেন। বৃত্তিও পেলেন মাসিক কুড়ি টাকা এর আগের বছর তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ফলে সাংসারিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়লো। এই বৃত্তির টাকাটা না পেলে হয়তো রামানন্দের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যেত। তিনি কলকাতায় এসে এক মেসে উঠলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এসময়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (স্যর) পড়তেন এই কলেজেরই বি. এ. ক্লাসে। আশুতোষের ছোট ভাই হেমন্তকুমার ছিলেন এই কলেজে রামানন্দের সহপাঠী।

বৃত্তির কুড়িটি টাকা তাঁর সম্বল। এদিয়ে সব খরচ চালাতে হবে। কিন্তু বাদ সাধলো এই প্রেসিডেন্সি কলেজ। তিনি যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন বেশ কিছুদিনের জন্যে কলেজ কামাই হলো। কারণ রামানন্দ জ্বরে শয্যাশায়ী। প্রেসিডেন্সি কলেজের তখনকার নিয়ম ছিল ভীষণ কড়া। পরের মাসে যখন তিনি বৃত্তির টাকা পেলেন, কুড়ি টাকার মধ্যে তেরো টাকা কাটা গিয়েছে কলেজে অনুপস্থিতির জন্যে।

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন রামানন্দ। এই তেরো টাকা দিয়ে সারা মাসটি তিনি চালাবেন কি করে?

ঠিক করলেন, প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়বেন। বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছিলেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বেতন এ-কলেজ থেকে কম। চলে গেলেন সেণ্ট জেভিয়ার্সে। দেখা করলেন বৃদ্ধ পাদ্রি প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে। সব খুলে বললেন। পাদ্রি সাহেব দেখলেন, এমন কৃতি একটি ছাত্র বিপদে পড়ে তাঁর কাছে এসেছে। তাকে সাহায্য করতেই হবে। বললেন, তুমি চারটি টাকা দাও। এই টাকাতেই তোমাকে ভর্তি করে নিচ্ছি।

তাই হলো। কিন্তু ল্যাটিন ভাষা না শিখলে তো এ-কলেজ থেকে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। ল্যাটিন তো তিনি একেবারেই জানেন না। তবুও রামানন্দ অনড়। শিখে নেব ল্যাটিন, তারপর পরীক্ষা দেব। কয়েক মাসের মধ্যে ল্যাটিনের প্রথম পাঠ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ ল্যাটিন ভাষা শিখে, এ-ভাষায় লেখা এবং পড়ায় অভ্যস্থ হয়ে নির্দিষ্ট এফ. এ. (First Arts) পরীক্ষা দিলেন রামানন্দ। স্থির অধ্যবসায়ই সফলতার একমাত্র পথ। এটা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মে-র কথা। এফ. এ. পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ হলেন। বৃত্তিও পেলেন এবার মাসিক পঁচিশ টাকা। এফ. এ. পাশ করে আবার তিনি বি. এ. পড়তে এলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই রামানন্দ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে বি. এ. পরীক্ষা দিতে পারলেন না। ফলে বৃত্তির টাকাও বন্ধ হলো। এর পরে এই বছরের গ্রীষ্মের ছুটির পর তিনি সিটি কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এ-সময়ে সিটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪০--১৯৭০)। ১৮৮৮-তে রামানন্দ এই কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করলেন প্রথম স্থান অধিকার করে। এবং সদ্য বি. এ. উপাধিপ্রাপ্ত যুবক রামানন্দ এই সিটি কলেজেই ইংরেজির অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলেন। রামানন্দের বয়স তখন মাত্র তেইশ বছর।

রজনীকান্ত সেন

জন্ম: ১৮৬৫ ॥ মৃত্যু: ১৯১০

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীন-দুঃখী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।'....

এ-স্বদেশী সংগীত কি বাঙালি কোনো দিন ভুলতে পারবে? না; পারবে না। যেমন পারবে না 'আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে/গর্ব করিতে চুর;/যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,/সকলি করেছে দূর।' গানটি কোনো দিন ভুলে যেতে। রজনীকান্তের গানে যখন বাংলাদেশ উত্তাল, কবির ভাগ্যে যখন যশ ও গৌরবের দিন এলো, ঠিক সেই সময়ে তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হলেন। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর রজনীকান্তের জীবনদীপ নিভে গেল। মৃত্যুর মাস-দুই আগে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুপথযাত্রী রজনীকান্তকে দেখতে এসেছিলেন মেডিক্যাল কলেজে। তিনি এক চিঠিতে তাঁকে জানালেন, 'সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনো মতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম।'

কি মর্মান্তিক মৃত্যু রজনীকান্তের! গলায় অস্ত্রোপচার করে গলনালী ফুটো করে দেওয়া হলো শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে। অস্ত্রোপচার করলেন ক্যাপ্টেন ডেনহাম হোয়াইট সাহেব। শ্বাস-প্রশ্বাসের দুঃসহ কষ্ট কিছুটা কমলো তাঁর, কিন্তু বাক্‌শূন্য হয়ে রইলেন আমৃত্যু। একটু স্বস্তি পেয়েই তিনি গান লিখতে লাগলেন। কেউ কোনো প্রশ্ন করলে তার উত্তর দেন কাগজে লিখে। যে-সুরেলা কণ্ঠ একদিন বাংলার আকাশ-বাতাস মাতিয়েছে, সে কণ্ঠ চিরদিনের জন্যে রইলো নীরব হয়ে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বাণী' (১৯০২), 'কল্যাণী' (১৯০৫), নীতি কবিতা 'অমৃত' (১৯১০), 'সদ্ভাব-কুসুম' (১৯১৩) প্রভৃতি বাঙালির মনোমন্দিরে চির-অক্ষয় হয়ে থাকবে।

রজনীকান্ত সেনের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ভাঙাবাড়ি গ্রামে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুলাই। পিতা গুরুপ্রসাদ ছিলেন কাটোয়ার মুনসেফ। মাতা মনোমোহিনী দেবী ছিলেন অশেষ গুণের অধিকারিণী। তিনি কাব্যানুরাগিণী ছিলেন। রজনীকান্তের পিতাও ছিলেন কবি। তাঁর লেখা 'অভয়া বিহার' গীতিকাব্য সেদিন অনেকের প্রশংসা পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পুত্র রজনীকান্তের মনে সংগীত ও কাব্যের বীজরোপণ করে দিয়েছিলেন তাঁর পিতা-মাতা উভয়েই। মনোমোহিনী দেবী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত ভক্ত ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, সীতার বনবাস ইত্যাদি বই তাঁর খুব ভালো করে পড়া ছিল। ছোটবেলায় রজনীকান্তকে তিনি এসব বইয়ের গল্প শোনাতেন। বাঙালির নিজস্ব ভাবধারাকে তিনি পুত্রের হৃদয়ে বাল্যকাল থেকেই মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন।

শৈশব থেকে রজনীকান্তের চোখেমুখে এমন একটি লাবণ্য ছিল যা দেখে সবাই শিশুটির প্রতি আকর্ষিত হতো। শৈশবে তিনি পিতামাতার সঙ্গে পিতার কর্মস্থলে থাকতেন। কাটোয়া থেকে পিতা কালনায় বদলি হলে রজনীকান্তও সেখানে আসেন। নবদ্বীপের ভাষা তাঁর আধো-আধো উচ্চারণে সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতো। তিনি

যখন চার বছরের শিশু তখন সুর করে গান গাইতেন—'মা আমায় ঘুরাবি কত।'

সংগীতপ্রিয়তা, আবৃত্তি করবার ক্ষমতা রজনীকান্তের শৈশব থেকেই দেখা যায়। যখন সবেমাত্র তাঁর অক্ষর-পরিচয় হয়েছে তখনই তিনি লোকের মুখে শোনা রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলে দিতে পারতেন। আত্মীয়-পরিজন, সকলেরই ধারণা হয়ে উঠেছিল বড় হয়ে রজনীকান্ত নামকরা গায়ক হবেন। বাল্যকাল থেকে মুখস্থ করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। যা-কিছু একবার শুনতেন, তা সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্থ হয়ে যেত তাঁর। পিতার বৈঠকখানায় বালক রজনীকান্তের মুখস্থ হওয়া রামায়ণ-মহাভারতের নানা অংশের আবৃত্তি শোনার জন্যে অনেক লোক আসতো।

বাল্যে তাঁর উদ্ধত স্বভাব ও অস্থির প্রকৃতি প্রতিবেশীদের জ্বালাতো। অশান্ত বালক ঘুড়ি-লাটাই, মার্বেল, ছিপ-বড়শি নিয়ে প্রায় সারাদিন মেতে থাকতেন। বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিবেশীদের গাছের ফল-ফুল চুরি, গাছে উঠে বহুবার গুরুতর আঘাত পাওয়া —কোনো-কিছুকেই গ্রাহ্য করতেন না।

দিদি বলতো—বাবা এলে বলে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ের উত্তর হতো—মারের ওপরে তো কিছু হবে না।

পিতা বোঝাতেন, তিরস্কার করতেন। কিন্তু ডানপিটে রজনীকান্ত বাল্য-চাপল্যে অনড়।

কিন্তু যেটুকু সময় পড়তেন, মন দিয়ে পড়তেন। তাতেই পড়া হয়ে যেত। বাল্যকালে রজনীকান্ত গ্রাম্য পাঠশালায় পড়েননি। বাড়িতে পড়াশোনা করে একেবারে রাজশাহীর বোয়ালিয়া জেলা স্কুলে ভর্তি হলেন। এই স্কুলের পরবর্তী নাম হয়েছিল 'রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল'। উদ্দাম চপলতার মধ্যেও রজনীকান্ত পড়াশোনায় একেবারে খারাপ ছেলে ছিলেন না। দাবা, ফুটবল, তাস এবং সর্বোপরি হারমোনিয়ম পেলে তিনি আর কিছু চাইতেন না।

রজনীকান্তের জ্যাঠামশাইয়ের দুই ছেলে বরদাগোবিন্দ ও

কালীকুমার তখন এম. এ., বি. এল. পাশ করে রাজশাহীতে ওকালতি করতেন। কালীকুমারের কাছে রজনীকান্ত পড়তেন। তাঁর এই দাদার কাছ থেকে তিনি ছোটবেলায় কবিতা রচনা করতে শিখেছিলেন। কথায় কথায় ছন্দ মিলিয়ে ছড়া কাটতে পারতেন এই বয়সেই। প্রকৃতপক্ষে রজনীকান্তের কাব্যগুরু হলেন কালীকুমার। একদিন তাঁর এক আত্মীয়াকে লিখলেন :

'শ্রীশ্রীযুতা !
আমার জন্যে এনো এক জোড়া জুতা।'

অথবা,

'পলিত হইলে কেশ
ধরিয়ে বরের বেশ
শ্বশুরের বাড়ি যাব হইয়ে জামাতা,
এ কি অদৃষ্টে মোর লিখেছে বিধাতা।'

বাল্যকালেই যেমন কব্যরচনা শুরু করেছিলেন রজনীকান্ত, সঙ্গে সঙ্গে চলতো সংগীতসাধনাও। কারও সুমধুর সংগীত শুনলে তিনি আত্মহারা হতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে-গান কণ্ঠে উঠিয়ে নিতেন। অনেক সময়ে গানের সব কথাগুলি মনে থাকতো না, তিনি ভাব ও অর্থের সঙ্গে মিলিয়ে সে-সব অংশ নিজেই রচনা করে নিতেন।

এছাড়াও তিনি শরীরচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন ছোটবেলা থেকেই। জিম্‌ন্যাস্টিকে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কলেজে পড়ার সময়ে রাজশাহী কলেজে জিম্‌ন্যাস্টিক দেখিয়ে পুরস্কার পেয়েছিলেন। হা-ডু-ডু খেলায় তাঁকে হারানো ছিল প্রায়-অসম্ভব। কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে একবার পদ্মানদিতে সাঁতার দিতে দিতে মাঝ-নদিতে গিয়ে মুশকিলে পড়েন। কিন্তু অসীম সাহসে সে-যাত্রা উদ্ধার পান। সেখান থেকে তীরে ফিরে আসেন।

নিচু ক্লাস থেকে এনট্রান্স ক্লাশ পর্যন্ত তিনি প্রত্যেক শ্রেণীতে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন। ক্লাশের শিক্ষক, বন্ধুরা অবাক্ হয়ে যেতেন এমন ডানপিটে ছেলের

রেজাল্ট দেখে। 'মর‍্যাল ক্লাশ বুক' পড়বার সময়ে তিনি এ-বইয়ের অনেকগুলি গল্প কবিতায় অনুবাদ করে ফেললেন। তখন তাঁর দশ-বারো বছর বয়স। তখন সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল। পরীক্ষায় আসতো 'ইংরেজি থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ কর'। রজনীকান্ত কিন্তু গদ্যে অনুবাদ না করে পরীক্ষার খাতায় সংস্কৃত কবিতা লিখে দিতেন। স্কুলের ছুটি উপলক্ষে তিনি যখন গাঁয়ের বাড়িতে যেতেন, তখন তাঁদের প্রতিবেশী সংস্কৃত-পণ্ডিত রাজনাথ তর্করত্নের কাছে সংস্কৃত পড়তেন। এ-সময় থেকেই তিনি সংস্কৃত কবিতা-রচনায়ও পারদর্শী হলেন। তিনি তাঁর 'ডায়েরি'র এক জায়গায় লিখে গেছেন: 'আমি কটকে উদ্ভট-সাগরকে (পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগর, বি. এ. [১৮৫৭-১৯৪৬]) যে সংস্কৃত কবিতা দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিলাম, তিনি তা প'ড়ে সে কবিতা ক'টি মাথায় করে হাজার লোকের মধ্যে পাগলের মত নাচতে আরম্ভ কল্লেন।'

রজনীকান্ত চিঠিপত্রে সামান্যতম বানান ভুল সহ্য করতে পারতেন না। তিনি বলতেন, মূর্খ তিন প্রকার: ১. যে লেখাপড়া জানে না, ২. যে সামান্য পত্রাদি লিখতেও বানান ভুল করে, ও ৩. যে পুস্তকাদিতে কোনো ভ্রমপ্রসাদ দেখলে সংশোধন করতে সাহসী হয় না।

অপরের লেখা গান গেয়ে তাঁর তৃপ্তি হতো না। কিশোর বয়স থেকেই তাই নিজে গান লিখে তাতে সুর দিয়ে গাইতেন।

(মায়ের) চরণ-যুগল প্রফুল্ল কমল
মহেশ স্ফটিক জলে,
ভ্রমর নূপুর ঝঙ্কারে মধুর
ও পদ-কমল-দলে।

এ-সব গান তাঁর কৈশোরেই লেখা। পরবর্তীকালে তিনি যে-সব কবিতা ও গান রচনা করেছেন তার ভিত তৈরি হয়েছিল ছোটবেলা থেকেই। এক সময়, বাংলা দেশের এমন কোনো ছাত্র ছিল না যিনি পড়েননি এই কবিতাটি:

স্নেহ-বিহ্বল করুণা-ছলছল
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে!

মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগি রে।
শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে ;
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে
তপ্ত তনু মম, করুণা-ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি, যাতনা-তাপ ভুলি,
বদন-পানে চেয়ে থাকি রে !....

গীতিকাব্যে মায়ের এমন মধুর রূপ কমই আছে।

রজনীকান্ত গ্রন্থকীট ছিলেন না। পরীক্ষার কয়েকদিন আগে থাকতে পাঠে গভীরভাবে মনোনিবেশ করতেন। তাতেই তিনি এনট্রান্স (১৮৮৩ খ্রী.), এফ. এ. (১৮৮৫), বি. এ. (সিটি কলেজ থেকে, ১৮৮৯) এবং বি. এল. (১৮৯১) কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে গেছেন। তিনি এ-প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন : 'দাবা, হারমোনিয়াম, তাস, টবল—এই নিয়ে কাটিয়েছি। যে-বার বি. এ. পাশ হলাম, সেবার বাটীতে ব'সে কেবল হিন্দু হোস্টেলেরই ৮০/৮২ খানা পোস্টকার্ড পাই—যে এমন পাশ।....আমি যদি পড়তাম, তবে স্পর্ধা ক'রে বলতে পারি, কেউ আমার সঙ্গে compete করতে পারত না। আমি গান গেয়ে হেসে নেচে পাশ হয়েছি। I was never a book-worm, for the blessed with very brilliant parts.

প্রকৃতই তিনি ছিলেন ব্রিলিয়াণ্ট। ওকালতি করেছেন কিছুদিন, পশার জমেনি। কাব্য ও সংগীত-রচনায় তিনি বাংলার আপামর জনসাধারণের প্রাণের কবি হয়ে উঠেছিলেন। তাই তো হাসপাতালে তাঁর মুমূর্ষু অবস্থায় সকল রকমের সাহায্য নিয়ে এসে দাঁড়াতে দেখি নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরকে, সাহায্য নিয়ে এসেছেন, কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দীঘাপতিয়ার রাজা, তুবলহাটির মহারাজ-কুমারগণ, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত, রামতনু লাহিড়ীর সুযোগ্য পুত্র শরৎকুমার লাহিড়ী,

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, কুমার শরৎকুমার রায়, প্রখ্যাত সাহিত্যিক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরাও সেদিন কবির রচিত 'অমৃত' গ্রন্থখানি হাতে হাতে বিক্রি করে কবিকে আর্থিক সাহায্য করেছে।

কিন্তু সব সাহায্য বিফল হলো। তিনি একদিন যে-গান গেয়েছিলেন, 'কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব, তোমারি রসাল-নন্দনে' —সেই 'রসাল-নন্দনে' যাত্রা করলেন 'তৃষিত এ-মরুর' সবাইকে কাঁদিয়ে।

হাসপাতালে বসে 'ডায়েরি' লিখতেন রজনীকান্ত। কথা বলতে পারতেন না। 'ডায়েরি'র কিছু-কিছু কথা উদ্ধৃত হলে তাঁর প্রতি দেশবাসীর সাহায্যের ও ভালোবাসার কথা জানা যাবে।

> 'আমার এই ক্ষুদ্র জীবনটুকুর জন্য কি চেষ্টা যে বাঙ্গালা দেশ করছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। বিলাত থেকে আমার জন্য রেডিয়াম নিয়ে এসে চিকিৎসার চেষ্টা হচ্ছে। তাতে ঢের টাকা লাগবে। তবু চাঁদা করে তুলে রেডিয়াম এনে আমাকে বাঁচাবে।—সে তিন চারি হাজার টাকার কাজ।'
>
> 'বঙ্গদেশ আমাকে ছেলের মত কোলে ক'রে আমার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করেছে, সেই জন্য আমি ধন্য মনে ক'রে ম'লাম।'
>
> 'বরিশাল থেকে যে যা যেখানে পাচ্ছে আমাকে পাঠাচ্ছে। ধন্য বরিশাল। দু'টাকা পাঁচ টাকা—যার যেমন ক্ষমতা সেই দিচ্ছে।'
>
> 'আমার গুণটা কি? আমি দেশের কি করেছি? দেশ আমাকে বড় ভালবেসেছে, বড় সাহায্য ক'রেছে। আমি দেশের তেমন কিছুই করতে পারিনি।'
>
> 'আজ রবি ঠাকুর আমাকে বড় অনুগ্রহ করে গেছেন। আমাকে

তিনি বললেন, "আপনাকে পূজা করতে ইচ্ছা করে।" শুনে আমি লজ্জায় মরি।'

'সত্য সত্যই শরৎকুমার, অশ্বিনী দত্ত, পি. সি. রায়, নাটোরের মহারাজা, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি আমাকে যে ভাবে সাহায্য করছেন ও যে ভাবে আশা দিয়ে পত্র লিখছেন, আমি শুধু উকিল হ'লে, আমাকে এতখানি অযাচিত সম্মান করতেন কি না সন্দেহ।'

বাল্যকাল থেকেই তাঁর যে সংগীতচর্চায় অদম্য উৎসাহ তার মূলে ছিলেন গ্রামেরই এক বয়স্ক সুহৃদ্ তারকেশ্বর চক্রবর্তী। রজনীকান্তের বয়স যখন চৌদ্দ, তারকেশ্বর তখন আঠারোয় পা দিয়েছেন। সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তিনি। এ ছাড়াও তারকেশ্বরের অন্য একটি গুণ ছিল। তিনি কবিওয়ালাদের মতো ছড়া বা পাঁচালি মুখে-মুখে রচনা করতে পারতেন! সেই তারকেশ্বর চক্রবর্তীর কাছে থেকে, তাঁর গান শুনে রজনীকান্তের সংগীত-লিপ্সা বেড়ে যায়। বিভিন্ন তাল ও লয়ের জ্ঞানও তিনি লাভ করেন তারকেশ্বরের কাছ থেকে। বলা যেতে পারে, তারকেশ্বরই রজনীকান্তের সংগীত-গুরু।

রাজশাহী কলেজে পড়ার সময় থেকে রজনীকান্ত ব্যঙ্গ কবিতা বা রস-রচনা লিখতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি ব্যঙ্গকাব্য রচনায় অত্যন্ত সাফল্য লাভ করেন। সে-সময়ে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান ছিলেন ব্যাকরণ-পণ্ডিত কালীকুমার দাস। রজনীকান্ত তাঁকে সংস্কৃতশ্লোকে ব্যাখ্যা করলেন এভাবে :

'ব্যাকরণে মহাবিদ্যা 'ব্যা' ব্যা-করণতৎপরঃ
কস্মিংচিদ্ যদি বা কালে ক্রিয়তেঽসৌ সভাপতিঃ।
সমারোহং সমালোক্য 'চরকীমাতং' প্রজায়তে॥'

অর্থাৎ এঁর (কালীকুমারের) ব্যাকরণ শাস্ত্রে মহাবিদ্যা কেবল ব্যা-ব্যা-করণতৎপর (ব্যা-ব্যা-করণ স্বভাব); কিন্তু যদি কোনও সময়ে এঁকে সভার সভাপতি করা হয়, তবে সভায় লোকসমাগম দেখে তাঁর চরকীমাত (ত্রাস) লেগে যায়।

রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড সাহেবের প্রিয়পাত্র কেরানী বিনোদবিহারী সেনকে নিয়ে ব্যঙ্গ করলেন :

'এডওয়ার্ড-কপেরম্ভা বিনোদ ইতি নামতঃ।
বিদ্যারম্ভা বুদ্ধিরম্ভা ইংলিশঃ সর্বদা মুখে ॥'

এমনি করে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষকের চরিত্র-বিশ্লেষণ করে তিনি সংস্কৃতে ব্যঙ্গকবিতা লিখেছিলেন।

রজনীকান্তের হাসির গান আজও আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁর লেখা :

'যদি, কুমড়োর মত চালে ধ'রে র'ত
পান্তোয়া শত শত ;
আর, সরষের মত হ'ত মিহিদানা
বুঁদিয়া বুটের মত !
(গোলা বেঁধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচতাম না হে ;)
(গোলায় চাবি দিয়ে চাবি কাছে রাখিতাম, বেচতাম না হে।)'...

অথবা,
নিজের গানেরই প্যারডি :

'কেন বঞ্চিত হবো ভোজনে
মোরা—কত আশা ক'রে, নিজ বাসা ছেড়ে
খেতে—এসেছি এখানে ক'জনে।'...

অথবা,
ইংরেজি না-জানা আদালতের মোক্তারকে নিয়ে :

'পরি, চাপকান-তলে ধুতি—
যেন যাত্রার বৃন্দে-দূতী।
দুটো ইংরেজী কথাও জানি,
শুধু ভুলেছি Grammarখানি,—
এই 'I goes', 'he come', 'they eats' বেরোয়
ক'রে খুব টানাটানি।'

কাব্যে কোনো দিকের প্রতি কলম ধরতে তাঁর ক্রটি ছিল না। যেমন স্বদেশী সংগীত, তেমনি হাসির গান; যেমন সাধনতত্ত্ব, তেমনি সৌন্দর্যপ্রিয়তা। সর্বজনপ্রিয় 'কান্ত-কবি' রজনীকান্ত তাই সংগীত-জগতে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।